মূল্য ঃ ৫ টাকা

সত্যের পথ

যারা ভগবানকে চায় শুধু তাদের জন্য

২২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

মে, ২০২৪
বৈশাখ, ১৪৩১

সূচীপত্র

২২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

বৈশাখ ১৪৩১/মে ২০২৪

দিব্যচেতনই আনে উদারমুক্তি জীবনমাঝে		৩
কর্মযোগ পথে ব্রহ্মলাভ	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪
পরম সত্যলাভে দিব্য কর্ম	তানিয়া ঘোষাল	১৫
ভগবৎ নির্ভরতায় শ্রদ্ধাপূর্ণ কর্ম ভক্তিরও সৃজক	সায়ক ঘোষাল	১৭
হৃদয়গ্নি শিখা	পার্থ সুন্দর ঘোষ	১৮
ভগবৎ প্রেম	ভক্তিপ্রসাদ	১৯
ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা	দেবপ্রিয়া ঘোষাল	২০
মা এর স্নেহসুধা	ভক্তিপ্রসাদ	২০
তোমার কথা	মনোজ বাগ	২১
চেয়ে আছি	মনোজ বাগ	২১
জানতে হবে	মনোজ বাগ	২২
তোমার আকাশ	মনোজ বাগ	২২
মা চেনা শিশু	মনোজ বাগ	২২
শ্রী অনির্বাণের সঙ্গে সংলাপ	আশুরঞ্জন দেবনাথ (শিলিগুড়ি)	২৩
বিশ্বাসে-নির্ভরতায়-ভালবাসায়-নিবেদনে হোক ব্রহ্মলাভ	অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৬

সম্পাদক : **রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়**

প্রকাশক ও মুদ্রক : **বিবুধেন্দ্র চ্যাটার্জী**
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণের স্থান : ক্লাসিক প্রেস
২১, পটুয়াটোলা লেন
কোলকাতা—৭০০ ০০৯

দাম : **৫ টাকা**

সবরকম যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি
(চতুর্থ তল)
কোলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ ঃ ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণাময়ীর নিকট
সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

সাক্ষাতের সময় ঃ
রবিবার বিকেল পাঁচটার পর

সম্পাদকীয়

দিব্যচেতনই আনে উদারমুক্তি জীবনমাঝে

আধুনিক জীবন প্রযুক্তি আশ্রিত। বৈদিক জীবন ছিল ভগবানে আশ্রিত। আধুনিক জীবনের মাঝে যে বিপুল পরিমাণ প্রযুক্তি — এরই রয়েছে তারই এখন নবীনতর প্রকাশ ঘটে দীপ্যমান হওয়ারই পর্ব মানবিক চেতনের পটভূমিটি গড়ে উঠেছে। ভগবৎ চেতন সবেরই মধ্যে বিরাজমান, এর উদ্বোধন হওয়ার। দিব্য চেতন, জগৎ নিরপেক্ষ নয়। দিব্য চেতন মানব জীবনের এগিয়ে চলবার অথবা স্থিত হয়ে থাকা। সবাবস্থায় বিরাজ করে। মানবের মধ্যে দিব্য চেতন উন্মোচন হলেই জাগ্রত হয় চেতনের সমগ্রতা। জগৎময় পরিবর্তনের ঢেউ চলছে। এই পরিবর্তন সূচিত হয়ে চলেছে জীবনের সব অঙ্গে, অঙ্গে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির মিলনের ফলস্বরূপ একের পর এক স্বাচ্ছন্দের উপকরণ হয়ে চলেছে জীবনের। মান বাড়াবার জন্য। জীবনের এই স্বাচ্ছন্দ এই জগৎ মাঝে জীবনের সব সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছেন। একের পর এক উপকরণ সমূহ জীবন মাঝে যে সব রূপান্তর নিয়ে আসতে পারে সেগুলি জীবনকে নতুন রূপে ফুটিয়ে তোলে। জীবনের সঞ্চালনে সে সব কর্মপ্রবাহ সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে শ্রম দিয়ে অথবা সমষ্টিগত বহু মানুষের সহযোগে গড়ে ওঠে। কম্প্যুটার পরিচালিত সব ব্যবস্থাগুলি জীবনের পথে সমন্বিত হয়ে গড়ে তোলে প্রযুক্তির সহযোগে চলমান জীবন। এমন চলমান জীবনের মধ্যে স্বাভাবিক মাত্রার প্রযুক্তির যে সীমা, তাকে অতিক্রম করেই গড়ে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারিক উপযোগিতা আর প্রয়োগের জন্য আকাঙ্ক্ষা।

We like to think about digital as the interaction between data and technology.

Data refers to any information that can be used for reference, analysis or computation. Your grocery shopping is data and so is the weather forecast. Today, most people think of data as specifically members, but other things like images and text are data too, because they are turned into numbers that can be processed, stored and transformed through computing.

Technology creates, captures, transforms, transmits, or stores data. For most of human history the technologies that performed these tasks were simple – stone tablets, papyrus, and paper. today, data are transformed at exponentially higher volumes and processed through myriad devices.

A digital mindset is the set of approaches we use to make sense or, and make use of, data and technology. This set of attitudes and behaviors enable people and organisations to see new possibilities and chart a path for the future.

(Paul Leonardi & Tsedal Neeley, The Digital Mindset, Harvard University Press, 2022, p. 10)

মানুষের চেতনার যে প্রকাশ অভিমুখ রয়েছে তার বিরাট অংশ অধিকার করে রয়েছে প্রযুক্তি পরিচালিত ব্যবস্থাদি। প্রযুক্তির প্রয়াস স্বতঃই মানুষের নিয়ন্ত্রণে থেকে মানুষের এই কর্ম মার্গে নিত্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গতিময়তায় আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে সক্ষম। কর্মজগতে প্রযুক্তির সহযোগের মূল উপাদান হল কম্পুটার। এরই মাধ্যমে বিশ্বময় যাতায়াত ব্যবস্থার হয়েছে বিপুল পরিবর্তন। এসেছে যোগসূত্র স্থাপন ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যোগসূত্রের ব্যবস্থা। কর্মের জগৎ ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলবার জন্যও হয়েছে বহু রকমের ব্যবস্থাদি। কৃত্রিম মেধার ব্যবহার বিপুলভাবে জীবনের নানা পর্বের মধ্যেকার পরিবর্তনকে সূচিত করে দিয়েছে। মানবের চিন্তার জগতে এর প্রভাব এখন বিপুল। বর্তমানের যে সব প্রয়াস রয়েছে ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্ককে নতুন করে গড়ে তোলার প্রয়াস।

এখন জীবনের সব ক্ষেত্রেই হয়ে চলা এই প্রযুক্তির প্রভাব ক্রমাগতভাবে এগিয়ে চলবে। এমন করেই হয়ে চলেছে জীবনের এই ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে চলে আসার পর্ব। শিক্ষার প্রয়াস, স্বাস্থ্য ছাড়াও শিল্প কারখানার কর্মক্ষেত্রের সর্বত্র কৃত্রিম মেধার মধ্য দিয়ে নবীন সব দিক হয়ে যায় উন্মোচন। শিক্ষালাভের ব্যবস্থাদি ও শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতি, পথ সর্বত্র হয়ে উঠেছে কৃত্রিম মেধার বিপুল মাত্রার প্রভাব। এই প্রভাব শুধুমাত্র পদ্ধতি ও প্রকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর প্রভাব হয়ে চলেছে বিপুল মাত্রার প্রভাব। এই বিপুল প্রভাবই শিক্ষার উপকরণেও চলে এসেছে। যে শিক্ষার পথ হয়েছে উন্মোচিত তার সবটাই ঐ ব্যাপক জীবন প্রবাহের সব অঙ্গ হতে হয়েছে বিস্তৃত। ক্রমে নিজ মেধার সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে থাকতেন যেন ব্যাপকভাবে জীবনের নানা পর্বে বয়ে উঠতে সদা অতিক্রমী হয়ে যেন জীবনকে গতিময়, উদ্যোগী ও নতুনের মধ্যে এসে যায় নিত্যদিন আর সব ক্রমে বিন্যস্ত হয়ে জীবনকে নবীন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে চায়। এত সবের পরই আবার ক্লান্ত অবসন্ন বিধ্বস্ত হয়ে গড়ে তুলছে জীবনের ক্ষুদ্রত্ব। মুক্তির দ্বার উন্মোচন হতে পারে একমাত্র দিব্য চেতনের প্রভায় ও স্পর্শে। ভগবানকে যে চায়; ভগবৎ পথের অভীপ্সা যার হয়েছে সেই পারে ক্ষুদ্রত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে দিব্য চেতনের উদার মুক্তি অর্জনে।

—ঃঃ—

কর্মযোগ পথে ব্রহ্মলাভ

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্মের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে জীবের চরিত্র ও ধর্ম। কর্মই জীবনের গতি ও পথ নির্দিষ্ট করে দেয়। কর্মের মধ্যেই নিহিত হয়ে যায় ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যবহারিক রীতিসমূহ। কর্মই জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। কর্মের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে জীবনের প্রতি ঐ ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি। যেমন করে হবে কর্মের রথ গতিষ্মান তেমন করেই হয়ে উঠবে জীবনের মাঝে জগৎ বিষয়ে জীবন দর্শন। জীবন দর্শন জীবের জীবনকে গড়ে দেয়। কর্মচিন্তা ও কর্মের রীতিনীতি অনুযায়ী জীবনের নিত্য প্রবাহ হয় প্রস্তুত। এমন করেই হয়ে উঠবে জীবনের গতিমুখ। এমনই বিকাশ পথের অভিমুখ হয়ে ওঠে বাইরের প্রতি আকৃষ্ট অথবা বাইরের প্রতি ক্রমাগত আকর্ষণ।

কর্মের মধ্য দিয়েই আসবে মুক্তি ও মোক্ষের পথ। কর্মের তেমন চরিত্র বিকাশ হলে সে কর্মের আবাহনীর পথ দিয়ে ফুটে উঠবে ভগবান লাভ করবার উপায়। কর্ম একটি বিশেষ ভাবের হয়ে উঠলেই হয় দিব্য কর্ম। এই দিব্য কর্মই জীবের অন্তর মাঝে গড়ে তোলে দিব্যভাব সংবেদ ও দিব্য ভাবদীপ্তি। এই দিব্য ভাব বিকাশ কর্মের চরিত্র বদল করে দেয়। দিব্য কর্মই যখন হয় জীবের অন্তর্নিহিত প্রেরণার উপাদান, ক্রমশঃই কর্মের নিত্য দিনের সংযোজনে উন্মোচন হয় দেবদীপ্তি।

I said to my soul, be still, and wait without hope
For hope would be hope for the wrong thing;
Wait without love
For love would be love of the wrong thing;
There is yet faith
But the faith and the love and the hope are all in the waiting.
Wait without thought, for you are not ready for thought :
So the darkness shall be the light and stillness the dancing.
Whisper of running streams, and within lighting.
The wild thyme unseen and the wild strawberry.
The laughter in the Garden, echoed cestary. (T. S. Eliot. East Coker, III, II. 123)

কর্মের কৌশল হল যোগ। ভগবানের সঙ্গে যোগ, জীব ও ব্রহ্মের যোগই অধ্যাত্ম পথ। জীবের জগৎ কর্মের মধ্যেই রয়েছে সব ব্রহ্ম কর্মের যোগসূত্র। জীব ও ব্রহ্মের যোগ হয় চেতনার রাজ্যে। চেতনার দীপ্তিতেই আসে ব্রহ্মভাব। জীবন কর্মের মধ্যেই রয়েছে সূত্র যারই অবলম্বনে হয়ে উঠবে সংযোগ জীব ও ব্রহ্মের। চেতনার দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে ভগবৎ প্রতিমা। জীবনের চলার পথে ক্রমাগতভাবে ব্রহ্ম সংবেদকে আবাহন করে যখন ব্রহ্মভাব হয়ে ওঠে স্বতঃই এক জ্যোতির্বলয়ের সঙ্গে আলো-অন্ধকারে মিশে থাকা আরেক অস্তিত্বের সঙ্গে। এমন করেই হয়েছে জীবনের মাঝে সম্ভাবনার সব সূত্র। যখনই এসেছে এমন সম্ভাবনার পর্বগুলি। সম্ভাবনার সূত্রগুলি যেমনে বিরাজ করে জগৎ মাঝে ব্যক্তির জীবনে বাইরে তেমনি এগুলি বিরাজ করে জীবের অন্তর মাঝে। অন্তরের গভীর গহ্বরে রয়েছে ভগবানের জন্য স্থান। শ্রদ্ধা-ভালবাসা আর বিশ্বাসকে নির্ভর করেই গড়ে ওঠে ভাগবতী চেতনা সব জীবের অন্তরে।

Fare forward, you who think that you are voyaging;
you are not those who saw the harbour.
And do not think of the fruit of action.
Fare forward.
O voyagers, O seamen
You who come to the port, and you whose bodies
Will suffer the trial and judgement of the sea
Or whatever event, this is your real destination.
So Krishna, as when he admonished Arjuna
On the field of battle.
Not fare well,
But fare forward, voyagers. (T.S. Eliot, The Dry Salvages, III, II, 149)

টি. এস. এলিয়ট প্রায় চৌত্রিশ বৎসর বয়সে লিখলেন 'দি ওয়েষ্ট ল্যাণ্ড। এরও ছাব্বিশ বছর পর উনিশ শ' আটচল্লিশে এলিয়টকে নোবেল পুরস্কার, সাহিত্যে দেওয়া হল। সাহিত্যের পটভূমিতে গূঢ় অধ্যাত্ম ভাবনাকে আনলেন এলিয়ট। উপনিষদ ও ভাগবৎ গীতার

মৌল তত্ত্বের প্রয়োগ করলেন এলিয়ট। প্রশান্ত চেতনের সন্ধান করলেন গভীর অন্তঃপুরের ভাবরাজ্যে ভগবানকে বরণ করে নিতে। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ভালবাসা শ্রদ্ধা এসবই সাময়িক মনের এককেটি ক্ষণিকের অবস্থা প্রায় সব সময়ে। অতি সামান্য কিছু ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ভগবানের জন্য প্রকৃত ভালবাসা গড়ে ওঠে। বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে জীবনে আছে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে হাতে গোনা কয়েক জনের। জীবনপথে ভগবানের কাছে সমর্পণের মধ্য দিয়ে আত্যন্তিক নিবেদন কেবলমাত্র কয়েক জনেরই হয়। এগিয়ে চল, নিবেদনের পথে।

জীবনের মূলে মহাপ্রাণের চির সামর্থ চয়নে ঃ

ঋচাং ত্বং পোষম্ অস্তেঃ পুপুষ্বান্।
গায়ত্রং ত্বৌ গায়তি শক্করীষু।
ব্রহ্মা ত্বৌ বদতি জাতবিদ্যাং
যজ্ঞস্য মাত্রাং বি সিমীত উ ত্বঃ।। (ঋ. বে. ১০/৭১/১১)

এখন ভগবৎ বাকের মহা উন্মোচন আর বিকাশের পর্ব।
সাধন প্রাণে এসেছে ঋকের স্পন্দন পরম প্রকাশের ক্ষণে।
যে প্রাণের মহিমা ছিল একাঙ্গী হয়েছে তা এখন কালজয়ী।
সময়ের সব ধাপ পেরিয়ে চলবে এগিয়ে জীবন প্রবাহ।
যে আবাহনে রয়েছে পরম সত্যের আকর্ষণ জীবনের পথ চলায়
হয়েছে তারই মূর্ত প্রকাশ নবীন সত্যের জাগরণ ও বরণে।
ঐ মহাপ্রকাশের এখন জগৎময় আকর্ষণী আর আবাহন পর্ব
এখন নিত্য সঞ্চারে ভাগবতী বিকাশের এই সূচনায় হয়ে মগ্ন।।

অন্তরমাঝে ব্রহ্মদীপ্তির জাগরণ ঃ

দেবানাং নু বরংয় জানা প্র বোচাম
বিপন্যয়াম উক্থেষু শস্যমানেষু যঃ পশ্যাৎ উত্তরে যুগে।
ব্রহ্মনাষ্পদে এতঃ সং কর্মাহ ই বাধমতঃ।
দেবানাং পূর্বে যুগে অসতঃ সদ্‌জায়তঃ।। (ঋ. বে. ১০/৭২/১-২)

যখনই হয়েছে মনের প্রদীপ জাগ্রত আলোক সঞ্চারী
জীবনের পর্বে পর্বে হয়ে চলেছে উন্মোচন ঐ গূঢ় সত্যের।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞার সঞ্চয় হয়েছে জগৎময় মানব চেতনের আগ্রহে।
এখন এই জীবন প্রবাহ হয়েছে ভগবৎ প্রকাশের নিত্য বাহন।
যে পথ প্রবাহ এসেছে জীবনের উত্তরণ তরে হোক তার বিস্তৃতি।
তোমারই তরে হয়েছে নিবেদিত এই বিকাশ ক্ষণের প্রজ্ঞা।
এখনই আসুক প্রত্যয়ের এই পরিচয় ভগবৎ ভাবদীপ্তির সহযোগে।
জগতের জীবনক্ষণ হয়েছে যুক্ত জীবনের এই নিত্য ভাব প্রবাহে।

চেতনার দান এই জগৎ প্রপঞ্চে ঃ

দেবানাং যুগে প্রথমে। অসতঃ সদজায়ত।
তৎ এষা অন্ধঃ জয়ন্তঃ। তৎ উতন পাদস্পরি।
ভূঃ যজ্ঞঃ উনতঃ অনপদৌ। ভূবঃ আশা অজায়ন্ত।
আদিতেঃ দক্ষৌ অনায়তঃ। দক্ষাৎ অদিতিঃ পরিঃ।। (ঋ. বে. ১০/৭২/৩-৪)

সৃষ্টির আদি এই ক্ষণে হয়েছিল আদি মাতৃশক্তির রচনা।
যা কিছু ছিল একান্ত এই নিবেদিত সদা প্রকাশের আদি সূচনায়।
যেমন করেই এসেছে জীবনের সত্য পর্বে সব অসত্যেরে করতে স্তব্ধ।
এই প্রকাশ ক্ষণের যে প্রেরণা পেরেছি তোমারই সদা সঙ্গে।
এসেছে তারই নিত্য বিকাশের নিত্য বিবেক স্থিতি এই অবস্থানে।
চেতনার প্রভায় এসেছে সৃষ্টির সব নিত্য বিকাশ পর্ব তোমায় বরণে।
ঐ অনন্তের জগৎ প্রকাশ হয়েছে অন্ত নিবেদন পর্বের একান্ত আদেশে।

একান্ত বিকাশের এই একাত্মতার পর্বে ঃ

অদিতিঃ অজনিষ্ঠঃ দক্ষঃ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অনব জায়ন্ত ভদ্রা অমৃত বন্ধবঃ।
যৎ এবা অদঃ সলিলে সুমং রজ্ঞা অতিতিষ্ঠতঃ।
অত্রা বো নৃত্যৎ তামিবঃ তীব্রঃ রেণুঃ অপায়তঃ।। (ঋ. বে. ১০/৭২/৫-৬)
আদি জননীর এক প্রকাশ ক্ষণের পূর্ণ দীপ্তির এই প্রকাশে।
যেমন করে হয়েছে জীবনের মাঝে ঐ আদি সত্যের প্রকাশে।
এখনই এসেছে জীবনের মাঝে অখণ্ড বিকাশের এই ক্ষণে।
আলোর প্রদীপ দিয়েছে জীবনের এই বেড়ে উঠবার পর্বে।
ঐ মহাকালের মহানৃত্যের তাণ্ডবের এই ক্ষণে হয়েছে বিকাশ।
মানবের এখন মহাপ্রকাশের পর্বের হয়েছে আবিষ্টের দীপ্তক্ষণে।
ঐ আদি মহামাতৃকার এই মহৎ ক্ষণের বিকাশ সত্যার্থে।
তোমারই এই নিত্য প্রকাশের জীবন আর জড়মাত্রায় প্রকাশ পর্বে।

এলিয়ট তাঁর মননের দৃষ্টিতে, কাব্যিক পটভূমিতেই খোঁজ করেছেন, কিন্তু খুঁজছেন নিজের অন্তরের অন্তঃস্থলে। অন্তরের গভীর প্রদেশে প্রবেশে করেই তিনি পেয়েছেন উপলব্ধির ঢেউ। নিজের অন্তরে উপলব্ধি দিয়ে জেনেছেন সার সত্য। ভগবানের সত্যকেই জীবনে খুঁজে পেলেন টি. এস. এলিয়ট। এরই পর্বে ও প্রবাহে তিনি জেনেছেন ভগবানকে ভালবাসতে হয়। জগতের যা কিছু ভালবাসা সবকিছুরই সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শর্ত-প্রত্যাশা-বাসনা-সংযোগ। শর্তই বিরাজিত সর্বত্র। জগতের যতকিছু সম্পর্ক সূত্র সবই শর্তযুক্ত। শর্ত কোথাও সুপ্ত, কোথাও বা আংশিক বা পূর্ণ প্রকাশিত। শর্ত রয়েছে লুপ্তপ্রায় লুপ্ত অথবা কোথাও যেন স্বাভাবিক প্রত্যাশায় যুক্ত হয়ে রয়েছে শর্ত। শর্ত পূর্ণ হওয়ার পথে রয়েছে প্রচুর পর্ব। কখনও শর্ত মেনে নিয়ে শর্তপূরণ হয়; কখনও বা পটভূমির বাইরে থেকেই হয় শর্তপূরণ। শর্ত পূরণ হওয়ার পথে যদি বা কোনও বাধা থাকে তবে তাকে বরণ করে নিয়েই অতিক্রম করতে হয় ঐ সব বাধা। শর্তগুলি নানা ধরনের হতে পারে। কখনও বা বৈষয়িক দেনা-পাওনার সম্পর্কিত শর্ত থাকে; আবার কখনও বা থাকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিন্যাসের এবং সম্পর্ক রচনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিমাপের শর্তগুলি।

ভাগবত গীতার নিষ্কাম কর্ম তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলেন টি. এস. এলিয়ট তার বিভিন্ন লেখায়।

There is the final addition, the failing
Pride or resentment at failing powers,
The unattached devotion which might pass for devotionless,
In a drifting boat with a slow leakage,
The silent listening to the undeniable
Clamour to the bell of the last annunciation.
I sometimes wonder if that is what Krishna meant–
Here between the hither and the farther shore
while time is withdrawn, consider the future
And the past with an equal mind.
(T.S. Eliot, Four Quarters, III.)

যা কিছু সম্পর্ক মানুষে মানুষে হয়েছে রচনা, তার অনেকগুলিই তাৎক্ষণিক শর্তের আবরণে আবৃত থাকে। আবার কিছু সম্পর্ক রয়েছে এখানে, যেখানে ঐ শর্তগুলির অলিখিত প্রয়োগ হতে লাগে দীর্ঘ সময়। শর্ত পূরণ করবার জন্য প্রত্যাশা জেগে ওঠে যখন একটি শর্ত হয়ে যায় পূরণ। একটি শর্ত পূরণ হলে তারপর আসে পরবর্তী শর্তের সময়। একটি শর্ত পূরণের অর্থ একটি প্রত্যাশা গড়ে তোলা। প্রত্যাশা যেন শর্তের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে থাকে। যত শর্ত আর যত প্রত্যাশা রয়েছে সবেরই সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে বাসনা। বাসনাগুলির পাখা রয়েছে। সুপ্ত-সুপ্ত বা প্রকাশিত শর্তগুলি প্রত্যাশার বাহনে বাসনার সঙ্গে হয়ে যুক্ত হয়ে যায় আকাশচারী। বাসনাগুলি ক্রমে ছোট থেকে বড় মাপের হতে থাকে। বাসনাগুলি জীবনের নিত্য বিকাশের পর্বে সাহায্য করে। জগতের জড় উপাদানগুলির সঙ্গে তার সংযোগ যেন অনন্য ভাবদীপ্তির প্রবাহকে নিয়ে আসে জগৎ পটে।

For us, there is only the trying. The rest is
not our business. (East Coker, V. I. 189)
What we call the begining is often the end

The moment of the rose and the moment of the yew-tree
Are of equal duration. (Little Gidding, V. II, 132)

শর্ত-প্রত্যাশা-বাসনার সহযোগে জীবন মাঝে গড়ে ওঠা দীপ্তিকে বরণ করে নেয় স্বতঃই। জগতের সব চাওয়া-পাওয়া; সব বাসনার গতিমুখ হল জড় তৃপ্তি ও জড় বিকাশ। অর্থ-সম্পদ-প্রতিষ্ঠা হল জড় তৃপ্তির বাইরের উপকরণ। এছাড়াও রয়েছে জড় তৃপ্তির জন্য জৈব উপভোগ। জড় তৃপ্তির সবরকম উপাদান ক্রমে জীবনের জন্য গড়ে দেয় জড় পরিচয়। এই জড় পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে ঐ মানুষটির জগৎ পটভূমি। মানুষটির অর্থ-সম্পদ-প্রতিষ্ঠা-ব্যক্তিগত জৈব পরিতৃপ্তির পরিসরই তার বিকাশের ব্যাপ্ত পটভূমিটি থেকে যায়। বিকাশের পথে হয়ত বা কোনও আঘাত, কোনও ব্যাথা, কোনও অপ্রাপ্তির বেদনা জীবের জীবন মাঝে যদি বা কখনও অন্ধকারের স্পর্শ বা অন্ধকারের পরশ নিয়ে আসে তখন জীবনের মাঝে আকাঙ্ক্ষার দিক বদল ঘটতে পারে। জড় আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা অতৃপ্ত আস্বাদন জীবনের পথকে একটু দিক্ বদল ঘটিয়ে ভগবানের দিকে নিয়ে আসতে পারে স্বতঃই। এখন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে বহু মানুষ জীবনের জন্য বৈরাগ্য বেছে নিয়েছেন। কোন না কোন আশ্রম-মঠ-মিশনের দ্বারস্থ হয়ে ক্রমে তাদেরই একজন হয়ে যাওয়ার নতুন জীবন ছন্দে মেতে উঠে জীব ক্রম সঞ্চারে জীবনের জন্য নিশ্চিত করে বরণ করার পথকে অঙ্গীকার করে নেন। এমন ক্ষেত্রে কর্মগুলির স্বরূপ পাল্টে যেতে পারে। যে জীবন মানুষের জন্য, সমাজের সাধারণ রীতির পথে এগিয়ে গিয়ে বিশেষ কর্মরাজি ও ভগবানের পথে নিবেদিত হয়ে স্বতঃই ব্রহ্মলাভ করবার উপযুক্ত ভ্রান্ত ভাবদ্বারা আক্রান্ত হয়ে সে জীবন ক্রমান্বয়ে অন্য পথকেই পরিণতির আদর্শ মনে করেই তৃপ্ত।

ভুবনমাঝে বিশ্বদেবতার প্রকাশ জীবনে ঃ

যৎ এব যতয়ৌ যথা ভুবনায় অপিন্বত।
অত্রা সমুদ্র আ গুল্হম। আ সূযম্ অজ ভর্তন্।
অষ্টৌ পুত্রঃ অসৌ অদিতৈঃ। যে জাতসঃ তু অনষ্পরি।
দেবাং উপ প্রেত সপ্তভিঃ। পরা মার্তন্ত অস্যৎ পরা। (ঋ. বে. ১০/৭২/৭-৮)

যখনই হয়েছে দেবতার এই বিকাশ পর্বের সূচনায়
নিত্য বিকাশের এই পর্বের সমগ্রতায় হয়েছে সব দেবতার একাত্মতায়।
যেমনই ছিল বিকাশের নিত্য স্ফূর্তি হয়েছে তা একান্ত উন্মোচন
ঐ অনন্ত চেতন সমুদ্রের অদৃশ্য শক্তির এখন জড় প্রকাশ জগতে।
ব্রহ্ম সত্যের সব স্থিতি ছিল যে অনন্ত বিকাশের সূত্র মাঝে
হয়েছে তারই এই বিপুল প্রকাশ ক্ষণের বিকাশে সূত্রের প্রবাহে।
মহাপ্রকাশের ক্ষণ-প্রবাহ জীবনের পর্বে পর্বে তোমায় চয়নে।
এখনই আসুক দেবতার এই বিকাশ পর্বের চেতন উন্মোচন জগতে।।

অনন্ত শক্তির এখন জগৎ বিকাশ ঃ

সপ্তভিঃ পুত্রৈঃ। অদিতিঃ অরূপে প্রৈত পূর্বম্ যুগম্।
প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎ। পুত্রঃ মার্তন্দ্রঃ অভারতঃ।। (ঋ. বে. ১০/৭২/৯)

জগৎ মাঝে হয়েছে জাগ্রত ভগবৎ চেতনের স্পন্দন।
মহাকালের এই কালপর্বে হয়েছে যত বিকাশ চেতন
এসেছে জীবনের মাঝে যত স্পন্দনের প্রবাহ হয়েছে উন্মোচন
ব্রহ্ম সত্যের এই সাধন পর্বে এসেছে জীবনের আহ্বান।
যা কিছু হয়েছে প্রকাশের আলোয় ব্যাপ্ত এই জীবনের পটে
হোক তারই বিকাশ পর্বের সূচনা নিত্য দিনের সত্য চয়নে।
জীবনের এই জাগরণ ক্ষণের প্রভায় দৃপ্ত জাগ্রত ঐ ব্রহ্মচেতন।
সৃষ্টির কুণ্ডলিনী শক্তির এখন ক্রম বিকাশের উর্দ্ধগতি।
সকল জড়ের মোহ ভ্রান্তির বাধা পেরিয়েই সহস্রারের অভীপ্সু সৃষ্টি।

প্রেরণার শক্তিতে ঃ

জনিষ্ঠাঃ উগ্রঃ সহসে তুরায়।
মন্ত্রঃ ওজিষ্ঠো বহুনঃ অভিমানঃ।
অবর্ধন এন ইন্দ্রং মরুতঃ অক্ষিতঃ।
অত্র মাতা যৎ বীরং দখনৎ এধনিষ্ঠা।। (ঋ. বে. ১০/৭৩/১)

এখন ইন্দ্রের শক্তির বিকাশক্ষণ আগতঃ জগৎ মাঝে।

বিশ্বমাঝে হয়েছে যত প্রকাশ পর্ব এখন তার বিস্তৃতি।
নিত্য-প্রসার-জগৎ মাঝে হয়েছে বিশুদ্ধ ভাব বিকাশের পর্বে
এখন এসেছে আহ্বান জীবনের পথে হয়েছে নবীন উন্মোচন।
নবীন ভাবনায় করতে আরও দৃঢ় হয়ে বিশ্বময় যাবে বিশ্বাতিতে।
যে ভাবনার সূত্র করে বরণ জীবনের পর্বে হয় দিব্য বিকাশ।
দেবতার এই ভাবনার প্রদীপ হোক শিখাময় রূপময় প্রসারে
এখন এসেছে ক্ষণ প্রেরণার শক্তি করে আরো দৃঢ় জগৎময় অভিযানে।

স্বতঃ বিকাশের ক্ষণ প্রভায় ঃ

দুহো নিশত্তা পৃশনী চিৎ এবৈঃ।
পুরু সংশেসন বাবৃধুষ্ঠ ইন্দ্রম্।
অভীবৃতের তা মহাপদেন।
ধ্বান্বাৎ প্রপিত্বাৎ উদরন্ত গর্ভীঃ।। (ঋ. বে. ১০/৭৩/২)

দেবতার এখন হয়েছে অন্তর মাঝে উদয়ের ক্ষণ।
যে বৃত্তিসমূহ হয়েছে মানবের একান্ত আপনার
এখন দেবতার নিত্য প্রভায় সে বৃত্তি সমূহ হয়েছে প্রতিভাত।
জীবন মাঝে হোক উদয় দেবশক্তির বিস্তৃত প্রভা
এখন ক্ষণমাঝে দেবশক্তির বিকাশ প্রভার হোক উন্মেষ
সদাই এই নিত্য প্রভার আকর্ষণ দিয়েছে জীবন মাঝে প্রেরণা।
যেমন করে হয়েছে ঐ নিত্য শক্তির ব্যাপ্ত প্রভার দৃপ্ত বিকাশ
এসেছে তেমনই প্রেরণার দীপ্তি জীবনের স্বতঃ বিকাশের ক্ষণে।

সংযোগ হয় জীবনের এগিয়ে চলার পথে। সংযোগটি হতে পারে জগতের সব জাগতিক বিষয়ের জন্য আবার এরই বিপরীতে রয়েছে সংযোগ ভগবানের সঙ্গে। ভগবানের সঙ্গে সংযোগ হতে পারে তখনই যখন শর্ত-প্রত্যাশা-বাসনা ইত্যাদি জীবনের অঙ্গন থেকে সরে গিয়ে জীবের মনোচেতনাকে মুক্ত করে দেওয়া। জীবের মনোচেতনাকে শর্ত-প্রত্যাশা-বাসনার প্রকোপ থেকে সরিয়ে নিয়ে ভগবানকে চাইতে শিখতে হবে। প্রত্যাশা যদি করতেই হয় তবে সেটি হোক পরিপূর্ণরূপে ভগবানের জন্য প্রত্যাশা করতে হবে। ভগবানের জন্য প্রত্যাশা করতে পারে যে কোনও ব্যক্তি। কিন্তু ঐ প্রত্যাশা পূরণ করতে হলে হতে হবে ভগবানের জন্য সম্পূর্ণ নিবেদিত। এখানে কোনও শর্ত বা বাসনার প্রভাব চলে না। শর্ত বা বাসনাদি জাগতিক বস্তু ও জাগতিক সম্পদের জন্য। ভগবানকে বরণ করবার জন্য চাই নির্বাসনার মন-প্রাণ ও হৃদয়। নির্বাসনা শুধুমাত্র সব নয়। নির্বাসনার পটভূমিতেই যদি ভগবানের জন্য ভালবাসা প্রস্তুত হলে মনের মধ্যেকার সব আবিলতা চলে যায়। যখন সব আবিলতা চলে যায়, যখন মন-প্রাণ-হৃদয় হয়ে যায় সুদূরের প্রত্যাশী; অঙ্গে অঙ্গে ফুটে উঠবে ঐ অনন্তের জন্য নিবেদিত হতে চায় চেতনা, তখনই শুরু হয়ে উঠবে দিব্য চেতনের মাঝে।

The conception of individual liberty ... must be based upon the unique importance of every soul, the knowledge that every man is ultimately responsible for his own salvation or damnation, and the consequent obligation of society to allow every individual the opportunity to develop his full humanity. But unless this humanity is considered always in relation to god, we may expect to find an excessive love of created beings. In other words humanitarianism, leading to a genuine oppression of human beings in what is conceived by other human beings to be their interest. (T. S. Eliot, Essays Ancient and Modern, London, Faber, 1936, 119.)

অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা যেন একটি কেমিক্যাল রিয়েজেন্ট। কেমিক্যাল রিয়েজেন্টের কাজ হল বস্তুর অবস্থা। পরিবর্তন ঘটানো। কোথাও এর কাজ কঠিন বস্তুকে গলিয়ে তরলে পরিণত করা, কোথাও বা এরই বিপরীত কিছু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্রমাগতভাবে এরই আবার ফিরে আসার প্রভাব বিস্তার করে কঠিন অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। মানুষ খাদ্য গ্রহণ করবার পর খাদ্য ও পরিপাক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় সে পথে নানা ধরনর কেমিক্যাল রিয়েজেন্টের প্রক্রিয়ার ফলে খাদ্যের অবস্থা পরিবর্তন ঘটে যায়, খাদ্য হয় নিষিক্ত। অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার প্রভাব মনের মধ্যেকার মালিন্য দূর করে।

At the still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless;
Neither from nor towards at the still point, there the dance is
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity.
Where past and future are gathered.

Neither movement from nor towards
Neither ascent nor decline
Except for the point, the still point
There would be no dance.
And there is only the dance.
(T. S. Eliot, Burnt Norton. I. II, 62)

এলিয়টের মধ্যে জেগেছিল অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা। এর ফলে মনের মধ্যেকার অন্য বিষয়ের ভার সরে গিয়ে প্রজ্ঞার পথ খুলে দিয়ছে। মুক্তির কথা মনে জেগেছে। এটি বুঝে নিয়েছেন মুক্তির পথ হল প্রথমেই একটি প্রশান্ত মনের গড়ন। প্রশান্ত মনটি নিবদ্ধ হতে পারে একটি গূঢ় বিষয়ের মধ্যে। প্রশান্ত মনের মাঝে গড়ে তুলতে হবে একাগ্রতার শক্তি। একাগ্রতায় মনটিকে নিবদ্ধ করে ক্রমে মনের মধ্যেকার সব জাগতিক বিষয়াদির প্রভাবগুলিকে অতিক্রম করে সরাসরি নিবদ্ধ করতে হয়। এমন অবস্থায় মনের মাঝে যা কিছু ছিল প্রতিরোধী সেগুলি দ্রবীভূত হয়ে যায়, এমন অবস্থায় কোনও শর্ত থাকে না মনে-না কোন শর্তাধীন হয় জীবন। জগতের জন্য যত কিছু ছিল ব্যক্ত বা অব্যক্ত শর্তাদি সবই ধুয়ে-মুছে যায়। শর্তগুলি সরে গেলে প্রত্যাশা ভেসে ওঠে। এমনও হতে পারে জগতের জন্য, মানুষের জন্য ব্যক্ত-অব্যক্ত শর্তাদি বিরাজ করে সেটি আবার ভগবানের উপরও শর্ত আরোপের প্রয়াস। যেমনটি জগতের জন্য দেনা-পাওনার শর্তাদি, তেমনি ভগবানের জন্যও এইসব এইসব শর্ত একের পর এক প্রয়োগ হতে থাকে। ভগবানের জন্য শর্তটি আবার একটু ভিন্ন। এটি লতার মত জড়িয়ে দেয়। শেষ হতে চায় না শর্তাদি। একের পর এক ঢেউয়ের মতই শর্তগুলি আছড়ে পড়ে ভগবানের উপর, দাবির পথ দিয়ে। যত সময় পর্যন্ত দাবিগুলি সম্পর্কের সূত্রের মধ্যে পড়ে, ভগবান সানন্দে গ্রহণ করেন ঐসব দাবির বহর পূরণও করে দেন। যেমন পিতার ঔদার্যে সন্তানের দাবি এমনকি অপরিনামি দাবিগুলিও এই ক্ষেত্রে ভগবান গ্রহণ করেন। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দাবিগুলি হয়ে যায় ট্রেড ইউনিয়নের দাবির মত — যার পিছনে কাজ করে নিছক সাময়িক স্বার্থ পূরণ ও জড়বুদ্ধিপ্রসূত ইচ্ছা পূরণের জন্য। এ দাবী ভগবান প্রত্যাখ্যান করেন ঐ ব্যক্তির কল্যাণ সুরক্ষায়।

জাগরণের এই নবীন উন্মোচনে ঃ

ঋস্বা তে পাদা। প্র যজ্জিয়াস।
সবর্ধন রাজা উত যে চিৎ অত্র।
ত্বম্ ইন্দ্র সালক অবৃকান্ তৎ।
সহস্র ইমাযন দধিষে। অশ্বিনা ববৃত্যা।।। (ঋ. বে. ১০/৭৩/৩)

দেবতার দেওয়া এই ব্রহ্মচেতনের হয়েছে মূর্ত প্রভা
ঐ অনন্ত চেতনের এই দিব্যভাব প্রবাহ আসুক জীবন মাঝে।
এখন জীবন প্রদীপ হোক মূর্ত জীবন মাঝে উন্মোচিত।
জগৎ প্রপঞ্চে তোমারই চরণ প্রদীপ হয়েছে ভাস্বর চেতন মাঝে।
এই চেতন প্রদীপ হোক জীবনের কালপ্রবাহের মাঝে দীপ্ত
হোক তোমারই শিখাময় জাগরণ জীবন মাঝে হয়ে মূর্ত।
তোমার এই দিব্য চেতন স্নাত হয়েছে জীবনের অভীপ্সা
এখন ভগবত্তারই মূর্ত প্রজ্ঞা আসুক জীবনের নবীন উত্থানে।।

দিব্য সম্পদের প্রবাহ পর্বে ঃ

সমনা তুনিঃ অরূপঃ যাসি যজ্ঞম্।
আ নাসত্যা সখ্যায় বক্ষি।
বস্যায় এবম্ ইন্দ্র ধারয়ঃ সহস্যা।
অশ্বিনা শুর দদতু ধর্মানি।। (ঋ. বে. ১০/৭৩/৪)

এই মন হয়েছে যদি পরিপূর্ণতায় একাগ্র তোমারই তরে।
যখনই এসেছে মনের মাঝে প্রেরণা তোমার অভীপ্সার পর্বে
হয়েছে প্রস্তুত এই মন একাগ্রতায় তোমায় একান্ত বরণে।
দাও তোমারই নিত্য ভাবকৃপার প্রবাহ জীবনে অবলম্বনে।
এখনই হোক আগ্রহের প্রদীপ প্রজ্জলিত নবীন প্রজ্ঞার জাগরণে।
যেমন করে করেছ তুমি উদার দান তোমারই ভাগবতী ভাবচেতনে।
তেমন করেই হোক জাগ্রত তোমার তরে নিত্য অভীপ্সা সাধন পর্বে।

দেবতার দান হয়েছে এই জগতের পটভূমিতে ব্রহ্মবরণ।।

দিব্য শক্তি এই প্রকাশ আলোয় ঃ

মন্দমান ঋতাৎ অধিঃ প্রকায়ৈ।
সখিভিঃ ইন্দ্র ঋষি এভিঃ অর্থম্।
আর্ভিহিঃ মায়া উপ দস্যু মাগান।
মিহঃ প্র তম্রা অবগৎ তপাংসি।। (ঋ. বে. ১০/৭৩/৫)
মহাসত্যের এখন এসেছে ক্ষণ মহাপ্রকাশের এই ক্ষণে।
যে জীবন প্রবাহে এসেছে এখন সদ্য নিবেদনে করতে আবিষ্কার।
এখন দেবতার এই ক্ষণ মাঝে হয়েছে ভাস্বর সাধন প্রাণের নিবেদনে।
যে প্রাণ হয়েছে উন্মুখ নিত্য সত্যের আবাহনের এই ক্ষণে।
হয়েছে সে প্রাণের এখন প্রকাশের উদার দৃষ্টির উন্মোচন।
দেবতার এই দিব্য শক্তির প্রকাশ আলোয় হবে স্তিমিত অদিব্য।
যা কিছু জড় শক্তির প্রবাহ অদিব্যের বিজয়ের অপেক্ষায়।
হবে সে সব নির্মূল এই দেবপ্রকাশ স্রোতে হতে দিব্য শক্তির প্রভায়।।

দিব্য আকর্ষণের উন্মোচনের পথে ঃ

সনাম অনৌ চিৎ অধ্বঃ এবঃ য় ন্যাস্প্যা।।
আবাহন্ ইন্দ্র উষসৌ যথানঃ।
ঋষ্বৈঃ আগচ্ছঃ সখিভিঃ অনিকামৌঃ সাকং।
প্রতিষ্ঠা হৃদ্যা জখন্থঃ।। (ঋ. বে. ১০/৭৩/৬)
ঐ মহাসূর্যের এই প্রথম উন্মেষের ক্ষণের মাঝে
হয়েছে যখন এই মহাপ্রকাশের মূর্ত উন্মোচন এই ভাবপর্বে।
এসেছে জীবনের এই এগিয়ে চলার পথে ছন্দে হয়ে নন্দিত সদাই।
ঐ ভাবপথের এই নিত্য প্রভায় হয়েছে মূর্ত উন্মোচন।
এখন তারই উদার ক্ষণ উন্মোচনের এই পর্বে হতে বিকশিত।
জীবনের এই প্রকাশ পর্বের হোক নিত্য উন্মোচন তোমায় করে বরণ।
জীবন পথে এখন ভগবৎ প্রভা করতে জীবন আবেশিত।
যা কিছু ছিল বাধার অঙ্গ হোক তার পূর্ণ অবসান এগিয়ে চলতে।।

ভগবানের সৃষ্ট এই জগৎ মাঝে দাবীদার চাওয়ার পরিণতি হল পতন। এলিয়ট অনুভব করলেন এই পতনের স্বরূপটি। জগতের জড় বিচারে যা কিছু চক্চকে, যা কিছু মূল্যবান তাকে পাওয়ার জন্য নিজে নিজে অথবা অন্যের সহযোগে চাওয়া-পাওয়ার দাবী গড়ে ওঠে মজবুত হয়ে। ট্রেড ইউনিয়নে যেমন হয়, একজন-দু'জন-দশজন-বহুজনের মিলিত ব্যক্তিস্বার্থ হয়ে ওঠে দাবীর নিরিখ। দাবীগুলির মধ্যে একদিকে থাকে বৈচিত্র আবার অন্যদিকে থাকে দাবী পূরণের জন্য মিলিত শক্তিপথ। ট্রেড ইউনিয়নের অভীষ্ট হয়ে ওঠে সেসব মিলিত চাওয়াপদ পূরণ করা। এর জন্যই কর্তৃপক্ষ পাবে দাবীর উত্তাপ। ব্যক্তি তার মনের গোপন চাওয়াকেই মিলিত করে নেয়।

Descend lower descend only
Into the world of perpetual solitude
World not World, but which is not world
Internal darkness deprivation
And destitution of all property
Dessication of the world of sense
Evacuation of the world of fancy
In operancy of the world of spirit
This is the one way...
(T. S. Eliot, Burnt Norton, III, II, 114)

চাওয়ার বহর এসে ব্যাপ্ত হয়ে যায় জড় বস্তু জগৎ বস্তু চাওয়ার পর্বেই। তেমনি করেই গড়ে উঠতে পারে জগৎ মাঝে ভগবানের জন্য চাওয়া। যদি সত্যিকারের ভগবৎ চাওয়ার শিকড় গড়ে ওঠে মানবের হৃদয় মাঝে যদি এমন হয় যে জীবনের যা কিছু রয়েছে এ পর্যন্ত তার সম্মিলন ঘটবে অন্তরে ভগবানের জন্য। ভগবৎ বিষয়ে চাওয়ার মধ্যেই আবার রয়েছে বিশুদ্ধ প্রীতিতে বরণ করা ভগবানকে। এই বিশুদ্ধ প্রীতির কারণে অন্তরের যা কিছু চাওয়ার জড় মাত্রা সেগুলিকে সরিয়ে যখন ভগবানকে চাওয়া প্রস্তুত হবে, তখন গড়ে উঠবে ভাগবতী চাওয়া। এমত চাওয়া কারণ ব্যতিরেকি যদি হয় তবেই হবে প্রস্তুত ভালবাসা। মানবিক ভালবাসায় অনেক চাওয়া-পাওয়া, লেন-দেনের হিসেব থাকে। ভগবৎ ভালবাসা হল — চাওয়া-পাওয়া বিরহিত, হিসাব-নিকাশ থেকে দূরে গিয়ে গড়ে ওঠা নিতান্ত নির্ভরতা আর গভীর গাঢ় অনুরাগ।

Here is not water but only rock
Rock and no water and the sandy road
The road winding above among the mountains
Which are mountains of rock without water. (Eliot, The waste land)

এলিয়ট বুঝলেন জীবনের ক্ষণিক ও স্থানিক পর্যালোচনার মধ্য থেকে দূরগামী হয়ে ওঠে যদি চেতনা তখনই শুষ্ক পাথেয় ব্যতিরেকী জীবনের বেড়ে ওঠার নিরেট এক ভাব বিকাশী। যখনই হয় ভালবাসার অনুষঙ্গ জীবনের পথ চলায় একটি পর্বের পর আর একটি পর্বে গড়ে ওঠে নিতান্ত নিবেদনের অনুভব ছন্দ। যেন ভালবাসার বীণাবাদ্য। মানবিক ভালবাসায় যেন রক্ত-মাংসের উপভোগ, বিষয় সম্পদ, দেনা-পাওনা, মান-প্রতিষ্ঠা এসবই মেশানো থাকে। ভগবানের জন্য ভালবাসা যখন ফুটে ওঠে তখনও কিছু চাওয়া-পাওয়া থাকে; মনের-প্রাণের বেদনা নিরসনের জন্য আবেদন থাকে, থাকে সব বেদনার আবর্ত থেকে মুক্তির আকৃতি। ভগবানের কৃপাপরশ রূপ এমন ক্ষণে হয়ে যায় উন্মোচিত। এমন ক্ষণে ভক্ত জনের ঐসব বেদনার আবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনার উন্মোচন হয়।

The sengle rose in now the garden
Where all loves end terminate torment
Of love unsatisfied the greater torment of love satisfied. (Eliot, The Family Reunion

এক একটি পর্বেই হয়ে যায় এক এক ধরনের বিকাশ। বেদনার বন্ধন, মোহের বন্ধন থেকে মুক্ত হবার ক্ষণ এসে যায় ভগবানের ভাবস্পর্শে। এক একটি ক্ষণের ভাব স্পর্শ নিয়ে আসে ঐ পর্বের জন্য স্বতঃই বিপুল মাত্রায় সম্ভাবনার উন্মোচন। যে চেতনের দৃষ্টি শুধুমাত্র আবদ্ধ হয়েছে পাথরে পরিবেশের রুক্ষ, রুদ্র বিস্তার। ভগবানের কৃপার বাতাসে রূপবদল হয়ে যায় এমন করেই মুক্তির পথের সন্ধান পেয়ে যাবেন ভক্তপ্রাণ। এমন ভক্ত প্রাণই আবার কৃপার বাতাস পেয়ে যেন নতুন করে জীবনের জন্য হয়ে ওঠে নবীন চেতনের নবীন উন্মোচনের ক্ষণ। এমন উন্মোচনের ক্ষণেই নতুন করে চেতন সূর্যকে উদয়ের আকাশে বরণ করে নেওয়ায় ভক্ত জীবন গড়ে ওঠে এবার নবীন বিকাশের শক্তিতে হয়ে ভরপুর।

But I thought I might escape from one life to another,
And it may be all one life, with no escape. Tell me
Were you ever happy here, as a child at wishwood. (Eliot, The Family Reunion)

সাধকের চেতন প্রদীপ এমন ভরপুর হয়ে উঠবে ভগবৎ ভাবে। যে ভাব প্রদীপ সাধকের জীবন মাঝে ভক্তির সজীব লতা রোপন করেই হয়ে উঠবে সচেতন জীবন প্রবাহে। এমন ক্ষণপর্বটি ধর্ম ও কর্মের অনন্য মেলবন্ধনের ক্ষণ। এখানে ভগবৎ ভাব বিন্যাসে এখন ভক্তজীবন হয়ে উঠবেন একাঙ্গী সাধক। এখন সব চাওয়া মিলে গিয়ে একান্ত বিন্যাসে বিন্যস্ত হয়ে নিপুণ ভাব আবর্তে হয়ে উঠবে ভরপুর। ভক্তজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি শুরু হয় ক্রমান্বয়ে গূঢ় ভক্তিলাভের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি উদ্যোগ এবং প্রতিটি কর্মই এখন ভগবানে নিবেদিতা।

ঋষির সাধন পর্বের সত্য বিস্তার ঃ

ত্বং জঘন্থ নমুচিং দাসং।
কৃণ্বান ঋষয়ে বিমায়ম্।
ত্বং চকর্থ মনবে সৌন্যান্ পথৌ।
দেবত্রজ অজঃ এব যানান্।। (ঋ. বে. ১০/৭৩/৭)

এই যজ্ঞপথ জীবনের জন্য হয়েছে উন্মোচন্ স্বতঃই।
এখন যজ্ঞের এই ব্যাপ্ত পথ মাঝে হয়েছে চয়ন সত্যের।
যা কিছু হয়েছে জীবনের জন্য উন্মোচিত জীবন পথের অভীপ্সায়।
এসেছে ঐ অনন্ত সত্যময় জীবন প্রভা নিত্য ভাবপথের প্রসারে
ঋষির ধ্যান মন্দিরে হয়েছ যে সাধন যজ্ঞ নিবেদনের প্রভায়।
এখন ঋষির সত্য হবে ক্রমে সঞ্চারিত সব সাধন জীবন প্রবাহে।

যে ভাবপথ হয়েছে উন্মুক্ত এই সত্যের শক্তি উন্মোচন পর্বে।
হোক তারই এই ভাবপর্বের মহাপ্রকাশে জীবনের অন্বয়ে।।

দেবভাবের মহাবিস্তার পর্বে ঃ

ত্বম্ এতানি পপ্রিমে বি নামঃ।
ঈশান্ ইন্দ্র দধিষে গভস্তৌ।
অনু ত্বা দেবাঃ শবসাঃ মদন্তি।
উপরি বুধ্নান বনি নক্ষত্র অকর্থ।। (ঋ. বে. ১০/৭৩/৮)

জগৎ মাঝে চেয়েছে যে প্রাণ হয়েছে সে প্রাণ প্রস্তুত।
প্রাণের প্রাচুর্যে হয়েছে বরণ করেছে তারই ব্যাপ্তি।
এখন দেবতার শক্তি হবে সঞ্চারিত জীবন মাঝের মূর্ত প্রদীপ।
এই ভাবপথের নিত্য বিকাশ হয়েছে স্বতঃই বিকশিত এখন।
যে ভাবপ্রদীপ হয়েছে এখন বিকাশের পথে উন্মুখ সে প্রাণ।
এখন উদার উন্মুখ এই সাধনের নিত্য প্রকাশ আর উন্মোচন ক্ষণ।
আসুক আহ্বান এখন জীবনের মাঝে সদা প্রকাশে।
যে ভাবপথের হয়েছে বিকাশ হোক তারই মহা বিস্তার জগতে।।

পৃথিবীর স্পন্দন মাঝে দিব্য জাগরণ ঃ

চক্রং যৎ অস্য অপস্বা নিষত্তম্।
উতো তৎ অস্মৈ মধ্বিচ এষ উদ্যৎ।
পৃথিব্যাং এত এষিত্বং যৎ ঊর্ধঃ।
পয়ো গোস্পদ এধি ঔষধীষু।। (ঋ. বে. ১০/৭৩/৯)

ভগবৎ প্রভায় হয়েছে মূর্ত এই কালের রথচক্র আর গতি।
যেমনে হয়েছে জীবন চেতনের ভাবপ্রদীপ মূর্ত জ্যোতির্ময়।
এখন বিকাশ ধারায় হোক সিঞ্চিত-চেতন বারির প্রবাহে।
যে চেতন ধারার হয়েছে মুক্তি তারই এখন জাগরণ ক্ষণ।
বিশ্বমাঝে হয়েছে সর্বত্র এই ব্যাপ্ত মনের প্রশান্ত ধারা
চেতনার স্পন্দন হয়েছে জাগ্রত তোমারই এই সাধন ব্রতে।
আত্মার জাগরণ ক্ষণ এখন উন্মুক্ত ঐ দিব্য আলোকের কিরণে।
তোমায় করেছে যে একান্ত আপনার হয়ে জীবনের উন্মেষে।।

ইন্দ্রশক্তিতে ভরপুর জীবন ঃ

অশ্বাৎ আয়তঃ এতৎ এতি যৎ বদন্তিঃ
ওজস্তো জাতম উত মন্য এনম্।
তৎ এতৎ জগৎ জীবন স্নাত স্রোতবৎ।
মন্যোরিয়ায় হম্যেষু তস্থৌ। যতঃ প্রজজ্ঞ ইন্দ্রো অস্য বেদ।। (ঋ. বে. ১০/৭৩/১০)

ইন্দ্রের শক্তি প্রভূত অশ্বশক্তির এই অনন্য প্রভায়
হয়েছে দেবশক্তির নিত্য প্রবাহ জীবনের গভীর প্রদেশে।
এখন এসেছে সময় ইন্দ্রের শক্তির অশ্বপ্রবাহে জীবনের পর্বে।
যে সাধন ব্রত হয়েছে জাগ্রত জগতের এই নিত্য প্রবাহে।
যা কিছু অদিব্যের প্রভাব ধাপ পেরিয়েছে হোক তার অন্ত জীবনে।
এখন প্রেরণার দীপ্তিতে হয়েছে জীবন গতিময় কালের পটে।
যে ভাবপ্রবাহ হয়েছে উন্মুক্ত জীবনের পথচলার মধ্যে।
তোমায় করেছি সমর্পণ জীবনের সব শক্তির নিবেদনের এই পর্বে।।

উপলব্ধির জগতে সাধকের ডুবে যাওয়ার এই ক্ষণে স্বতঃই ব্রহ্মস্পর্শের ভাব অনুভব সঞ্চার হয়। নিবেদিত কর্ম প্রকৃত পক্ষে নিষ্কাম কর্ম হয়ে ওঠে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রতি কর্মযোগ শিক্ষা দানে এই মনোভাব ও চেতনার উদ্বোধনে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি অর্জুনকে বললেন ঃ কর্মনিঃ এব অধিকারঃ তে মা ফলেষু কদাচন। (২/৪৭)। আত্মতত্ত্ব বলতে গিয়ে কর্মের মৌল তত্ত্ব তিনি অর্জুনকে শিক্ষা দিলেন। আত্মার জাগরণের ক্ষণে জীবের জীবন ও কর্ম বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গির রূপান্তর ঘটে যায়। কর্মাদি জীবের অধিকার কর্মের মধ্যে দু'টি বড় বিভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, জগৎ কর্ম-জীবন, ধারণ, পালন ও গড়নের জন্য যে সব কর্মাদি সে সব মিলেই প্রস্তুত হয়

জগৎ কর্ম। এর মধ্যে আবার স্বার্থ যুক্ত ও স্বার্থবিহীন হতে পারে। বহু বিষয়ের জগৎ কর্ম রয়েছে যেগুলি মানুষের উদার, বিশাল মাপের হৃদয়ের পরিচয় দেয়। সমান, দেশ, বিশ্ব আবার প্রকৃতি পশুকূল—ক্ষুদ্র প্রাণাদির বিষয়ে যাদের আগ্রহ-ভালবাসা আছে আর ঐ সব ক্ষেত্রে এগিয়ে চলবার জন্য যারা এমনকি নিজের সামর্থ-অর্থ-সময় ইত্যাদি বিনিয়োগ করেন, তারা মহৎ।

Who is the third who walks always beside you?
When count, there are only you and I together
But when I look ahead up the white road
There is always another one walking beside you
Gliding rope in a brown mantle, hooded
I do not know whether a man or a woman
But who is that on the other side of you?
(–T. S. Eliot, The Waste Land, 360)

অনুভব শুরু হলেই বোঝা যায় আরও একজন রয়েছেন যিনি সদা সঙ্গী। জড় অভীপ্সা পেরিয়ে যখন মন ভগবানে আকৃষ্ট হয় তখনই বুঝতে পারে পূজা-উপচার, নানা রীতি নীতি, আচার সবই ভাল, কিন্তু সব ভাল পেরিয়ে রয়েছে আরও কিছু ভাল সংবেদ — যেটি ভগবানকে বরণ করা সদা মননে। মনন গভীর হলে যদি মন বিশুদ্ধ হয় আর হৃদয় মুক্ত হয়ে ভগবানের জন্য আকাঙ্খা থাকে তবে তার দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে যে ভগবান হয়ে রয়েছেন সদা সঙ্গী। এলিয়ট দেখছেন একজন তৃতীয় ব্যক্তিক্রম পর্যায়ে যেন একই সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন সম্মুখ দিকে। এমন অনুভবটি যেন এক দৃশ্যত অদৃশ্য ব্যক্তিত্ব যেন সহযাত্রী হয়ে চলেছেন সঙ্গী সাধকের। জীবনের এই বিস্তৃত চলার পথের সেই পথ প্রদর্শক হয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। যেন তারই ক্রম আহ্বানে তারই অভিমুখে নিজে নিয়ে চলেছেন ঐ দিব্য পুরুষ। জগৎ পরিচয়কে অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে দেব পরিচয়ের অভিমুখে এই জীবনে।

Ganga was sunken, and the limp leaves
Waited for rains, while the black clouds
Gathered far distant, over himavant.
The jungle crouched, humped in silence.
Then spoke the thunder
DA-DA-DA.
Datta - Dayodhvam - Damyata
Damyata : The boat responded
Gaily to the hand expert with sail and oar
The sea was calm, your heart would have responded
Gaily, when invited beating obedient
To controlling head.

গঙ্গার পরম বিশুদ্ধ দিব্য বারির স্রোত এসেছে এখন স্বয়ং মহাকালের কৃপা পরশে মহাকালের কৃপার স্রোত এসেছে জগৎ জনের জন্য। এই বারি প্রবাহ যেন চেতন স্রোত হয়ে এসেছে জীবনের জাগরণের জন্য দিব্য বারি যেমনে আসে জীবনের স্পর্শে তেমনিই এসেছে এখন চেতনের এই দিব্য স্রোতপথে। ঐ হিমালয় শীর্ষ হতে নটরাজ দেবাদিদেবের দিব্য স্পন্দন এখন এসেছে জগৎ পথের এই নিত্য অভিযানে। এখন সকল অভিযান হয়েছে জীবনের জন্য অগ্রগামী। জীবন মাঝে এমন দেব সংবেদ এসেছে এগিয়ে চলার ছন্দে। ঐ মহাকাশের দব্য জ্যোতির্ময় সব নক্ষত্রের আলোক রাজী জীবনের জন্য আহ্বান করে নয়ে এসেছে দব্য চেতনের বার্তা। এই দিব্য চেতন বার্তা দেবতা-মানব-অসুর সবারই জন্য। মহাকালের মহান কণ্ঠের আহ্বান এখন করেছে স্পর্শ জগতের এই চেতন স্রোত হয়েছে তখনই দিব্য বিকাশের পটভূমি প্রস্তুত। এমন করেই হবে জীবনের জন্য আহ্বান। দয়োধ্বম-দত্ত-দাম্যত—এই তিন বিশাল আহ্বানের আকর্ষণে চলে এসেছে ভাগবতী আহ্বান। অসুর স্বভাবের মানবদের এখন এসেছে আহ্বান নিজের ক্রোধ-লোভ-মোহ আর মলিন সব চেতনার উপাদানের প্রভাব করে অতিক্রম হবে নির্মল চরিত্র ও স্বভাবের। নিজের অস্তিত্বের সুরক্ষা আর নির্মল বিকাশের জন্য হ'তে হবে প্রস্তুত। অসুর চরিত্রকে এখন হতে হবে সংযত। নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে অসুর চরিত্রকে ক্রমে তার দম্ভ অভিমান রাগ বিদ্বেষ লোভ মোহ ইত্যাদির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। যে দৈবী বাকের আহ্বান এসেছে হতে দয়োধ্বম, তারই অনুসরণে প্রতিষ্ঠা করতে হবে অসূয়াশূন্য কলঙ্কবিহীন চরিত্র।।

তোমায় দেখি মুগ্ধ নয়নে ঃ বয়ঃ সুপর্ণা উ অপঃ সঃ এদৎ ইন্দ্রং।
প্রিয়ং এধা ঋষয়ো নাধমানাঃ।
অপ ধাবন তম্ ওর্নহি পুর্ধিঃ।
চক্ষুঃ মুমুগ্ধয়ঃ মান নিধয়েরঃ বদ্বান্।। (ঋ. বে. ১০/৭৩/১১)

ঐ দিগন্ত বলয়ে রয়েছে কিঞ্চিৎ আলোর আভা
এসেছে যদি জীবন পথের নিত্য মাধুর্যে তোমারই দৃপ্ত আহ্বান।
হোক নিত্য প্রকাশের এই দ্বন্দ্বপথে চয়ন তোমারই ভাগবতী স্পর্শ।
উঠেছে আহ্বানের স্পন্দন নিত্য দিনের এই সাধন প্রভায় জীবনে।
তোমারই কাছে হয়েছে এখন উন্মোচন ঐ ভাববিকাশের এই ক্ষণে।
এখন আসুক প্রভা জীবন মাঝে করে বহন তোমার ইচ্ছার স্পন্দন।
ঐ উদ্ধলোকে দেবসকাশে দিয়েছে যে ভাবপ্রভা হয়ে কৃপাসিক্ত সাধনপ্রবাহে।
এখন অবতরণের যা কিছু প্রভায় হয়েছে পূর্ণ হোক তার প্লাবন জগতে।।

মানবের দৈবী স্পন্দন ঃ

বসুনাং বা চকৃষঃ হয়ক্ষমঃ।
ধিয়া যজ্ঞেঃ বা রোদসৌঃ।
অর্বন্তোঃ বা যে রয়িমন্ত! সবতৌ।
বনুং বা যে সুশ্রর্ণ সুস্রতৌ এধা।। (ঋ. বে. ১০/৭৪/১)

সত্যের আকাঙ্ক্ষায় হয়েছে মগ্ন দেবগণ সদাই নানাধামে।
এখন মানবের মাঝে হয়েছে সূচনা তোমায় বরণের প্রবাহে।
যে ভাব বিকাশ এসেছে জীবনের এই জাগরণ পর্বে হয়েছে অন্ত।
নিত্য প্রভায় হোক মগ্ন জগৎ ব্যাপ্ত এই দৃপ্ত চেতন প্রবাহ।
অদিব্যের অন্ধকার হয়েছে দূরগামী এখন দিব্য ভাব স্পন্দনে।
হয়েছে যদি একান্ত নিবিষ্ট নিবেদনের এই পথের সদা উন্মোচনে।
শ্রবণে মননে করেছে আহ্বান ঐ দিব্য চেতনের নিত্য প্রবাহে।
এখন হোক ব্যাপ্ত তোমারই ভাবপ্রদীপ উন্মোচন জীবনের পর্বে পর্বে।।

দানব চরিত্রের প্রয়োজন সংযত হওয়া। লোভ ঈর্ষা-ক্রোধ-কামে-বাসনা-বসনার আবৃত মানবের জীবন দানবীয় চরিত্র গুণের। এইসব দানবীয় চরিত্র অহং দ্বারা পরিচালিত আর যত রকম রিপু রয়েছে সবেরই প্রভাব রয়েছে এই চরিত্রে। দানবীয় গুণের দ্বারা পরিচালিত জীবন নিজ স্বার্থ বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয় সবসময়ে। এমনকি মন্দির বা ভগবানের স্থানে যা কিছু নিবেদন-ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সেসব কিছু অংশ প্রকৃত মাত্রার, বাকীটা সাজান। এই সাজান ভক্তি বা বিশ্বাস ও ঐ দানবীয় চরিত্রের মানুষদের জন্য ভক্ত পরিচয় এনে দিতে পারে কিছুদিনে জন্য। কিন্তু এ পরিচয়ের ভ্রান্তি কিছু দিনেই ফুটে ওঠে।

Datta : What have we given?
My friend, blood shaking my heart
The awful daring of a moment's surrender
Which an age of prudence can never retract
By this and this only, we have existed
Which is not to be found in our obituaries
Or in memories draped by the beneficient spider
Or under seals broken by the lean solicitor
In our empty rooms. (–T. S. Eliot, The Waste Land, 400)

মানবীয় গুন বৈশিষ্টটি মেশানো। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন এ যেন মাছির মত — যেটি কখনও বিষ্ঠায় আবার কখনও জাগরণের ফলে সন্দেশে এসে বসে। মানবিক মনটি সবসময়ে কাম-ক্রোধ-লোভ-স্বার্থ এসবের আবর্তে আবৃত থাকলেও কখনও বা হয়ে ওঠে এসব থেকে মুক্ত। এমন ক্ষণে তার দৃষ্টিভঙ্গি উদার হয়। ভগবানে মন বসে। যখন শুনবেন আহ্বানঃ দ-দ-দ...হে মানব, 'দত্ত'। দান কর নিজেকে, উৎসর্গ কর নিজেকে। যা কিছু মঙ্গলময়ের চরণে অর্পণযোগ্য — যেমন, তোমার জীবনভোর অর্জিত সত্য-উপলব্ধি, জীবনের নিত্য আহৃত ভাগবতী অনুভব, আর সর্বোপরি জীবনের পথচলায় বিশ্বাস-নিবেদন হয়ে উঠুক যথাযথ, তবেই ক্রম পর্যায়ে ঘটবে উত্তরণ। মানবিক চেতনের মাঝে ফুটে উঠবে দিব্য পরশ। জীবনকে গড়ে দেবার জন্য এবার দৈবী গুণের সমাবেশ ঘটতে থাকবে মানবের জীবন মাঝে। যে চেয়েছে এটি পরিণামে তারই জন্য হবে ভগবানের দান। ভগবত্তার এই অনন্য উপহার হয়ে থাকে জীবনের জন্য একান্ত পরিনামী। মহাশূন্য থেকে আহ্বান বাণী আসে জীবের চেতনে — 'দ' - 'দম্যত' - হে সত্ত্বগুণি, দৈবী স্বভাবী, অহংকে মুছে ফেল, ভগবানের কাছে কর আত্মনিবেদন। বিশুদ্ধ হৃদয়ের আত্মনিবেদনে সমগ্র জীবন ব্রহ্মজ্ঞান আবৃত হয়ে যায়; জগৎ কর্ম হয়ে ওঠে ব্রহ্ম কর্ম স্বতঃই।

—ঃঃ—

পরম সত্যলাভে দিব্য কর্ম

তানিয়া ঘোষাল

ব্রহ্ম সনাতন তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। সেই ব্রহ্ম সনাতনই ইচ্ছা করলেন, সৃষ্টি রচনা করলেন। এই জগৎ, এই জীবন, জড় সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি। জগৎ সৃষ্টির মাধ্যমে লীলাবিস্তার ঘটালেন। তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হল মানুষ। এছাড়াও না জানি তিনি আর কতরকম কিছু সৃষ্টি করছেন, কত বিচিত্র মানুষ, গাছপালা পশুপাখি, জীব জড় আর এমন কত কি যা আমাদের সীমিত দৃষ্টিতে দেখাও সম্ভব নয়। সেই তিনি এক এবং অদ্বিতীয় বিভক্ত করে দিলেন নিজেকে বহুতে। এই সমগ্র সৃষ্টিতে এমন কোনো সত্ত্বা নেই যাতে তিন বিরাজিত নন। এমন কোনো প্রাণ নেই যা তাঁকে জানতে পারে না। এমন কোনো জীব নেই যার তাঁকে ভালবাসার অধিকার নেই। সবাইকেই তিনি নিজের হাতে অতি যত্ন নিয়ে গড়ে তুলেছেন। এই সমস্ত সত্ত্বার মধ্যে মানুষ একমাত্র যেখানে কিন্তু ব্রহ্মসনাতনের প্রকাশ প্রবল। কারণ তিনি মানুষকে আবেগ ধারণ করার জন্য মন দিয়েছেন, যাচাই করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন। অনুভূতি দিয়েছেন, অনুভূতিকে সংযম করার শক্তি ও দিয়েছেন। ঠিক ভুল বিচার করার শক্তি দিয়েছেন। মানব মস্তিষ্ক দিয়েছেন যা অনন্ত সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। সর্বপরি মানব হৃদয়ে তিনি জ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা ভালোবাসা দিয়েছেন মানুষকে দিয়েছেন ব্রহ্মসনাতনকে জানবার, চিনবার তাঁকে আপন করে নেওয়ার চাবিকাঠি। আর সম্ভাবনা তিনি সবার মধ্যেই দিয়েছেন কিন্তু তাঁর সাথে সাথে তিনি স্বাধীনতা দিয়েছেন পছন্দ করে নেওয়ার। অর্থাৎ যিনি জগতের মাঝে রয়েছেন তিনি কেবল জাগতিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, চাওয়া, পাওয়া, এসব নিয়েই ব্যস্ত থাকতে পারেন আবার তিনি চাইলে ভগবানকে নিয়েও ভাবতে পারেন, ব্রহ্ম সনাতনকে ভালবাসতে পারেন, তাঁকে উপলব্ধি চেষ্টা করতে পারেন নিজ অন্তরে। সেই ব্রহ্ম সনাতন কখনও কারও চাওয়াতে হস্তক্ষেপ করেন না। যিনি যেমন চাইবেন তিনি তেমন পাবেন। যিনি চালটা, কলাটা, মুলোটা পেয়ে সুখী তিনি তাঁকে সেটা দিয়েই ভুলিয়ে রাখেন। আর যিনি এসবের উর্দ্ধে উঠে গিয়ে সেই দিব্যভাবকেই ভালো বেসেছেন, বরণ করেছেন তিনি তাঁর কাছে চিরতরে নিজেকে বেধে ফেলেছেন।

এমন অনেকের এমন ধারণা আছে জগৎ সংসারে থেকে ভগবানলাভ সম্ভব নয়। সারাদিন চাল, কলা, আলু, মূলো, নিয়ে কাজ করলে মন তো সেটা নিয়েই পড়ে থাকবে। এটাই স্বাভাবিক। ভগবানলাভ যদি করতেই হয় তা সংসারে থেকে সম্ভব নয়, সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে হবে বনে বা হিমালয়ের কোনো গুহায়। তবেই ভগবানকে লাভ সম্ভব। যারা ভগবান লাভ করার জন্য সংসারের সমস্ত লোভ, লালসা, আকর্ষণের হাতছানি উপেক্ষা করে নিজেদের জীবন ভগবানের কাছে সঁপে দিয়েছেন তাঁদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা রেখেই বলছি জগৎ সংসার ত্যাগ করেই ভগবানকে পাওয়া যায়, জগৎ সংসারে থেকে তাঁকে লাভ করা যায় না এই তকমা সর্বৈব ভুল। সংসারে থেকেও ভগবানকে পাওয়া সম্ভব! সম্ভব! যারা বিশ্বাস করেন সংসারে থেকে তাঁর প্রতি ভালবাসা লাভ করা সম্ভব নয়, তাদের কাছে একটাই প্রশ্ন যদি সেটাই সত্যি হত তবে এই জগৎ সংসার তিনি কেন সৃষ্টি করবেন। নারীরূপ, পুরুষরূপ সৃষ্টি, পরিবার সন্তান সন্ততি, মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এসব কেন তিনি সৃষ্টি করবেন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় হয়েও কেন নিজেকে বহুতে বিভক্ত হলেন। কেন সব প্রাণে তিনি আত্মারূপে অবস্থান করছেন। সংসারে থেকে, সব ধরনের দায়িত্ব জগৎসংসারে পালন করেও তাঁকে ভালবাসা যায়, জানা যায়, উপলব্ধি করা যায়।

শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন "Be in the world, but not belong to it". অর্থাৎ জগতে থেকে সব কাজ করো কিন্তু পার্থিব গুণ গুলি অর্থাৎ মোহ, মায়া, লোভ লালসা যেন মনে প্রভাব বিস্তার না করতে পারে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভারী সুন্দর একটি গল্প বলতেন এ প্রসঙ্গে। এক বড়লোকের বাড়িতে এক ঝি কাজ করতেন। বড়লোকের সন্তানদের তিনি খুব ভালবাসতেন। মুখে বলতেন "আমার রাম, আমার শ্যাম, আমার যদু, আমার মধু"। তাঁদের খুব যত্ন করতেন। কিন্তু সে মনে মনে জানে এরা তার কেউ নয়। তার আপনজন আছে গ্রামের বাড়িতে, কাজ বড়লোকের বাড়িতে করছেন কিন্তু মন পড়ে রয়েছে গ্রামের বাড়িতে আপন সন্তানের দিকে। অর্থাৎ জগৎ সংসারে সবকাজ দায়িত্ব সহকারে পালন করবে কিন্তু মনে জানবেন এরা কেউ আপন নয়। ভগবানই একমাত্র আপন, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা একমাত্র ভগবানই বাসতে পারেন। বাকি সব ভালোবাসার পিছনেই কিছু কিছু স্বার্থ লুকিয়েই থাকে। পার্থক্য শুধু কোনো সম্পর্কে স্বার্থ প্রকাশিত, কোনো সম্পর্কে স্বার্থ লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে।

অর্জুন বললেন ঃ কার্পন্য-দোষ-উপহত-স্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম সংমূঢ়চেতাঃ।
যৎ শ্রেয়ঃ স্যাৎ নিশ্চিতং ব্রুহি তৎ মে
শিষ্যঃ তে অহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।। (ভাগ. গী. ২/৭)

শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের যুদ্ধের পটভূমিতে দাড়িয়ে যখন অর্জুনকে ভাগবতী পথের দিশা দেখাচ্ছিলেন, অর্জুন যে মোহ, মায়া, হতাশার, ঘেরাটোপে হারিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলেন সেই হতাশা, মোহ, মায়ার ঘেরাটোপ থেকে উদ্ধার করার জন্য, শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে নিঃসৃত হল ভগবৎ গীতা। অর্জুন শরণ-নিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে। অর্জুন প্রার্থনা জানালেন ভগবানের কাছে, তিনি যেন ভগবানের শিষ্য হিসাবে গৃহীত হন। যে ক্ষুদ্রত্ব ও ক্ষণিক পার্থিব ভাবসঞ্চার হয়েছে অর্জুনের মধ্যে, তার আবেষ্টন থেকে মুক্ত করে যেটি তার পক্ষে শ্রেয়পথ সেটিই যেন ভগবান বলে দেন এবং সেই পথেই তাকে ভগবান পরিচালিত করেন। অর্জুনের দৌলতে সমগ্র বিশ্ব-সংসার পেয়ে গেল তার জীবনের ম্যানুয়েল। ঋষি বললেন ভগবৎ গীতা ভগবান কাউকে আদেশ দেননি মেনে চলার জন্য। তিনি উপদেশ দিয়েছেন, তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যিনি দিব্যজীবন চান তাঁকে তার জীবন চালনের উপদেশ দিয়েছেন। অর্জুনের মত যিনি চাইবেন সেই পরমাত্মাকে, যিনি নিজেকে সমর্পণ করবেন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে তাঁর জন্য এই ভগবৎগীতা ভগবানের মুখ থেকে নিঃসৃত হল। ভগবৎগীতার প্রথম অধ্যায় বিষাদ যোগে বিষাদগ্রস্ত অর্জুন ভগবানের ভর্ৎসনা পেয়ে সমন নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পন করলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন অর্জুনের হাত ধরে তাকে নিয়ে গেলেন কর্মযোগের দিকে। অর্জুনের দিব্য শিক্ষার সূচনা হল কর্মযোগ দিয়ে। (সাংখ্য যোগ)

ভগবৎ গীতায় কর্মযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিখ্যাত শ্লোক হলঃ

কর্মণ্যেব্যধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফল হেতুর্ভুমা তে সঙ্গোহস্তকর্মণি।।
(ভগবৎগীতা, অধ্যায়—২ শ্লোক—৪৭)

অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, "কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে তোমার কোনো অধিকার নেই। তুমি ফলের আশা ছাড়, অতএব হে অর্জুন। তুমি কর্মত্যাগ করিও না। কর্মযোগের ভগবানের এই উপদেশকে যদি আমরা আমাদের কর্পোরেট জগতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে যাই তবে স্বাভাবিকভাবেই কিছু প্রশ্ন উঠে আসে। গোটা কর্পোরেট জগৎটা চলছে টাগের্টের উপর; লাভ-ক্ষতির উপর। এই পরিস্থিতিতে কর্মযোগ কতটা যুক্তিযুক্ত সেটা নিয়েই প্রশ্ন। এই প্রশ্নটা একার নেই ওঠে কারণ মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কর্মের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বা Goal এবং কর্মের ফলাফলের মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে যায়। ভগবান বলছেন কর্মের উদ্দেশ্য বা Goal যদি না যাকে সে কম পথভ্রষ্ট হয়। অর্থাৎ কর্মী যদি তার কর্মের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন না হন তবে তার কর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। তারফলে কর্মী সে সংস্থার সাথে জড়িত সেটি ক্ষতির সম্মুখীন হবে। তাই ভগবান বলছেন কর্মের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া কর্মীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বর মধ্যে পড়ে। কিন্তু যখন কর্মের ফলাফলের আকাঙ্ক্ষা থেকে যখন কর্মী নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন তখনই তিনি প্রকৃত কর্মযোগী হয়ে উঠবেন। অর্থাৎ কর্মের সাফল্য লাভে অতিরিক্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে চলবে না আবার ব্যর্থতায় ভেঙে পড়লেও চলবে না। দুই পরিস্থিতিতেই একজন কর্মযোগী ধীর, স্থির, অচঞ্চল চিত্ত থাকতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন ঃ

সুখ দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবদ পাপম বাপ্স্যসি।।
(ভাগবতগীতা ২য় অধ্যায়, শ্লোক— ৩৮)

অর্থাৎ সুখ, দুঃখ লাভ ক্ষতি জয় পরাজয় সমান ভাবিয়া যুদ্ধ কর। ইহা করিলে তুমি পাপভোগী হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝালেন ঃ "হে অর্জুন তুমি যদি এই যুদ্ধ, জয়লাভের ইচ্ছা নিয়ে করে থাক তবে যুদ্ধে যদি তুমি হেরে যাও তুমি দুঃখ পাবে, হতাশা, অবসাদ তোমাকে ঘিরে ধরবে। তুমি তোমার কর্মক্ষমতা হারাবে, আর যদি তুমি যুদ্ধে জয়লাভ কর তবে তোমার মধ্যে অহংকার জন্মাবে। সেই অহংকার থেকে তুমি আরও রাজ্য জয় করতে অগ্রসর হবে যা তোমার লোভ লালসাকে বৃদ্ধি করবে, বহু মানুষের দুঃখের কারণ হবে তুমি যুদ্ধের ফলে অন্তিমে তোমার বিনাশ হবে। কিন্তু তুমি যদি তোমার কর্মফলের প্রতি আসক্তি না রেখে ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ কর তবে অন্তিমে বিজয় তোমারই হবে। কিন্তু কর্মযোগ বা যেকোনোরকম যোগকে জীবনে প্রয়োগ করাটা সেটা ভাষায় লিখে প্রকাশ করা বা মুখে বলার থেকেই অনেকটা কঠিন হয় এ ব্যাপারে ঋষি পতঞ্জলী যোগশাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন, যা বৌদ্ধ শাস্ত্র Majjhim Nikaya তে পাওয়া যায়

" Sow a thought, rcap an act.
Sow an act, rcap a habit
Sow a habit, rcap a character
Sow a character, rcap a destiny"

অর্থাৎ কর্মযোগের বা যেকোনো যোগ যখন আমরা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে যাই তখন সেই যাত্রাটি শুরু হয় আমাদের চিন্তাধারা থেকে। কর্মীর কর্মের পিছনে কর্মীর চিন্তাধারা নির্ধারণ করে কর্মের চরিত্র, কর্মের গুণমান, এ বিষয়ে একটি গল্প আছে ঃ তিনজন কর্মী একটি জায়গায় বসে ইট ভাঙ ছিল। প্রথম কর্মীকে একজন এসে জিজ্ঞাসা করলেন যে সে কি কাজ করছে? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথম কর্মী বলেন ঃ তাঁকে ইট ভাঙতে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে বলা হয়েছে এর পরিবর্তে তাকে টাকা দেওয়া হবে অর্থাৎ তার কাজের পিছনে প্রেরণা হল টাকা দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিলেন, কাছাকাছি কোনো বিল্ডিং তৈরী হবে তার জন্য ইট ভাঙছেন অর্থাৎ তিনি কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে বিশেষভাবে অবগত নন, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি উত্তর দিলেন যে সেখানে ভগবানের মন্দির তৈরী হচ্ছে এবং সেই মন্দির তৈরীতে সাহায্য করার জন্য তিনি ইট ভাঙছেন। প্রথম দুই ব্যক্তির ভাঙা ইটের টুকরোগুলি সমান আকারে ছিল না এবং কাজের স্থানটি অগোছালো এবং অপরিষ্কার কারণ কাজটি তারা ভালোবেসে করেননি। কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তারা সঠিকভাবে অবগত ছিলেন না। কাজের ফলাফল অর্থাৎ প্রাপ্য টাকার মূল্যে কাজটির থেকেও অনেকবেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অর্থাৎ কাজের পিছনে এই দুই ব্যক্তির মনোভাবই তাদের কাজের গুণাগুণ নির্ধারণ করেছে। অন্যদিকে তৃতীয় কর্মী যিনি কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন এবং সর্বোপরি পূর্ণ ভক্তি সহকারে সেইকাজ তিনি ভগবানের জন্য করেছিলেন যার তার ভাঙা প্রত্যেকটি ইটের টুকরো ছিল সমান সমান আকারে এবং কাজের জায়গাটিও ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সুতরাং যদি কর্মযোগকে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে হয় তবে সর্বপ্রথম পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের চিন্তায়। ভগবানকে ভালবেসে চিন্তায় তাঁর দিব্যভাবকে বরণ করবার মাধ্যমেই আমরা আমাদের চিন্তার গতিপ্রকৃতি স্থির করতে পারি। চিন্তা যখন দিব্যভাবে নিষিক্ত হয় তখন সময় হয় সেই চিন্তাকে কর্মে রূপান্তরিত করার। দিব্যচিন্তা যে কর্মের উৎস, সেই কর্মও দিব্যকর্মে পরিণত নয়। একই কর্ম যখন আমরা বারংবার পুনরাবৃত্তি করি তখন ধীরে ধীরে তা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। এবং সেই অভ্যাস দীর্ঘস্থায়ী হলে তা আমাদের চরিত্রে পরিণত হয়। সুতরাং যখন দিব্যকর্মের পুনরাবৃত্তি হয় বারংবার সেখান যে অভ্যাসের জন্ম হয় তা দিব্যভাবে সিক্ত হয়। দিব্য অভ্যাস থেকেই তৈরী হয় দিব্যচরিত্র এবং আমাদের চরিত্রই আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করে আমাদের কর্মের মাধ্যমে। যদি কর্মযোগে যুক্ত হতে হয় তবে জীবনের প্রতিটি স্তরেই অভ্যাসকে গড়ে তুলতে হবে। আজ ভাবলেই কাল যোগে যুক্ত হয়ে যাওয়া হয়। দীর্ঘ সময়ের অধ্যাবসায়, প্রস্তুতি, সাধনার দ্বারা এই যোগে যুক্ত হওয়া যায়। হে দিব্যপুরুষ তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা কর্মযোগ যেন আমি জীবনে পালন করতে পারে, কর্মযোগে যেন এই জীবন আক্ষরিক অর্থে যুক্ত হতে পারে, তোমায় জানতে পারি, চিনতে, ভালবাসতে পারি। হৃদয়ে হৃদয়ে দিব্যভক্তি, ভালবাসা অচল অটল বিশ্বাসের জন্ম দাও প্রভু।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

—ঃঃ—

ভগবৎ নির্ভরতায় শ্রদ্ধাপূর্ণ কর্ম ভক্তিরও সৃজক

সায়ক ঘোষাল

ভগবৎ ভাবই জীবনকে করে তোলে এক প্রকৃত সাধন ভূমি, এই জীবন শুধু দু একটি বাহ্যিক জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় জীবনের আছে এক গহন ও গূঢ় প্রত্যয়। প্রত্যেকটি জীবনের গতি ভিন্ন হতে পারে বা প্রত্যেকটি জীবন স্বাছন্দের ভাব রূপে ভিন্ন হতে পারে কিন্তু প্রত্যেক জীবনে চক্রের উদ্দেশ্য এক এবং অদ্বিতীয়। যতক্ষণ না সেই উদ্দেশ্য পূরণ হবে সেই জীবন চক্র ঘুরতে থাকবে। সেই উদ্দেশ্য একটি ভগবৎ ভাবে ভগবৎ চেতনে জীবন যাপন করে ঈশ্বরলাভের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া। এই ঈশ্বর লাভের পথটি কারর জন্য কারর জন্যে ভিন্ন। জীবনের প্রত্যেকটি সময় ওঠানামা আসতে থাকে। জীবনের পথ নিয়েই যেখানে প্রতিবন্ধকতা থাকবে সেখানেই স্পর্ধা থাকবে। প্রতিবন্ধকতা, বাধা, এসবই জীবনকে উন্নততর হতে সাহায্য করে, শিখতে সাহায্য করে যে কীভাবে বর্তমান পরিস্থিতি থেকে আরো উন্নত হওয়া যায়। যেকোনো কাজ সেটির উদ্দেশ্য যদি কোনো শুভ জনিত হয় তাহলে তার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা আসবেই। ভালো কাজ, শুভ কাজ মানেই ভগবানের কর্ম। আর সেটি সম্পূর্ণ করতে গেলে তো ভক্তকে নিখুঁত হতেই হবে। জীবনে হারা জেতা মান অপমান সুখ দুঃখ থাকবেই কিন্তু মন কখনো এগুলো ছেড়ে দেখ যে কী জিনিস প্রতিক্ষা করছে! এইসবই বাহ্যিক জিনিস হয়ে থাকবে জীবনে কিন্তু জীবনের রাজা যিনি তাঁকেই ধরে থাকতে হবে। এমন কে হতে

পারে যে এসব কিছুকে গ্রাহ্য না করে শুধুই তার আরাধ্যের দিকে চেয়ে থাকবে। শত প্রতিকূলতা দুঃখ-সুখ জয় করে স্থির থেকে নিজের ভগবানের প্রত্যেকটা সময়, কাজ তথা নিজের বুদ্ধি ও চেতন ব্রহ্মকে নিবেদন করে তাঁর মধ্যেই স্থির থাকবে। সেই হল পরম প্রিয় ভক্ত যার নিজের ভগবানের প্রতি শুধু বিশ্বাস না, আছে অন্ধবিশ্বাস। এই সেই ভক্ত যাকে কেউ আটকাতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে যে ভগবানকে নিজের অন্তরে খুঁজে পাবে সেই পারবে ক্রমশ ভগবৎ লাভের দিকে ছুটে যেতে। ভক্তের সাথে যাই হোক যে পরিস্থিতিই আসুক না কেন ভক্তের বিশ্বাস তাঁর আরাধ্য পরমপ্রিয় ভগবান তার সাথে সব সময় আছে। তিনি সর্বত্র ভক্তসঙ্গি হয়ে থাকেন। তিনি পরম পিতা হয়ে আবার পরম বন্ধু হয়ে সাহায্য করেন পদে পদে তিনি জ্যোতির্ময় সত্ত্বা রূপে জীবনকে আলোকময় করেছেন। তিনি সেই সূর্য যে সমগ্র সৃষ্টিকে দিয়েছেন প্রাণের উদগীত। তিনি জীবনের সম্ভাবনার বীজ হয়ে প্রত্যেকটি জীবের মধ্যে নিত্যই নবীনরূপে বসবাস করছেন। তিনি কর্মশক্তি হয়ে বিরাজমান করছেন কর্মজগতে। তাঁকে আলাদা করে বাইরে খুঁজতে হবে না। তিনি অন্তরেই ধরা দেবেন যদি ঠিক ঠিক ভাবে তাঁকে ডাকা যায়। শুদ্ধচিত্ত এবং অপাপবিদ্ধ মনই তাঁর পরম প্রিয় ভক্তকে সাহায্য করতে এগিয়ে যেতে তাঁর কাছে। জীবনে যদি ভগবৎ ভাবের প্রতি টান থাকে ভগবৎ লাভের প্রতি আকাঙ্ক্ষা থেকে থাকে তাহলে জীবন কখনো বিমুখ হয় না। তাঁর চরণ পদ্ম ধরে থাকলে বড়ো বড়ো ঝড়ও কিছুই করতে পারবে না, জগতে এমন কোন শক্তি আছে যা ভক্ত ভগবানের ভালোবাসার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

ভগবৎ ভাব জগৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা জীবন করে তোলে নিষ্কলুষ। জীবনে মনে যত বাজে প্রভাব আছে সব দূরীভূত হয়ে যায় মন হয়ে যায় শুদ্ধ মন আরো এগিয়ে যায় ভগবানের পথে। ক্রমশ জ্ঞান সংগ্রহ করে নিজের জীবনধারনের উদ্দেশ্য সফলের পথে চলতে চলতে মন এগিয়ে যায় মূল্য উদ্দেশ্য পূরণের পথে। এই মূল উদ্দেশ্য ভগবৎ উপলব্ধি, মন যত উপলব্ধি করবে মত জ্ঞান সংগ্রহ করবে তত এগিয়ে যাবে এই ভগবৎ গুণ সম্পন্ন মনের পরিণতি হয়ে। যা শুধু নিজেকেই নয় সংসারকেও উদ্বুদ্ধ করে। ভগবৎ কর্মে দায়িত্ব কারর কাধে পড়লে সেই কর্মে যদি ক্রটি থেকে যায় তাহলে তার দায় ভার ভগবানের ওপর এসে যায়। তাই কর্ম সর্বসময় করতে হবে নির্ভুল সঠিক। কর্মের ফল এবং প্রভাবের দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ না করে শুধু কর্ম করে যেতে হবে ভগবানের জন্য। ভগবৎ কর্মই এগিয়ে নিয়ে যাবে ভগবৎ পথে। ভগবৎ কর্ম সাহায্য করে জীবনের উন্নতি সাধনে। ভগবৎ কর্মই সাহায্য করবে জীবনের মাঝেই ব্রহ্মলাভে।

—ঃঃ—

হৃদয়গ্নি শিখা

পার্থ সুন্দর ঘোষ

"সা বিদ্যা যো বিমুক্তয়ে"

বিদ্যা সেটাই যা আত্মাকে মুক্তি প্রদান করে। বেদবিদ্যাই অন্যতম। কারণ সনাতন ধর্মের অন্যতম প্রধান গ্রন্থই হলো বেদ। যার অর্থ জ্ঞান। অর্থাৎ বেদবিদ্যার মাধ্যমেই জ্ঞান লাভ বা মোক্ষ লাভ। মোক্ষই হয় যুক্তি। অর্থাৎ মুক্তি উপায় হল আত্মজ্ঞান লাভ। গীতাতে বলা হয়ছে " ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিব বিদ্যাতে"। সনাতন ধর্মের সর্বচ্চ হল মোক্ষলাভ, চেতনার উন্মেষ। এই দুঃখময় ভবসাগরের জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি।

পরমেশ্বরকে জানার একমাত্র উপায় হল নিজেকে জানা। সেই জানার উপায় হল বিদ্যা।

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন জ্ঞানের মত পবিত্র এই বিশ্বপ্রকৃতিতে কিছু নেই। (গীতাতে অগ্নিকে জ্ঞানের সাথে তুলনা করছে। আমাদের মধ্যে যে অবিদ্যা বা কামনাবাসনা আছে, এই অগ্নিরূপ জ্ঞান ঐ কামনাবাসনা গুলোকে পড়িয়ে সোনারূপ ধারণ করবে বা কেবলমাত্র বিদ্যাই বর্তমান থাকবে।)

সনাতন হিন্দু ধর্মের মানুষ হলো স্বাধীন, কিন্তু মায়ামোহন দাস। সনাতন ধর্মই একমাত্র ধর্ম যেখানে একাধিক পথ আছে ভগবানের সেবার জন্য বা ভগবানের স্মরণ মননের জন্য। কেউ ভক্তি পথে, কেউ জ্ঞান পথে, কেউবা সাধনা পথে, কেউবা নিষ্কাম কর্মের পথে ভগবান লাভ করতে পারে। আবার এমনও হয় যার সারাটা দিন চলে যায় কেবল নিজের এবং সংসারের সবার খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করার চিন্তায়। তিনিও সৎপথে নিজের কাজকে ঠিকভাবে করে উপবাস লাভ করতে পারেন। সনাতন হিন্দু ধর্মানুসারে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবান লাভের অসীম সম্ভবনা আছে। তাইতো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা ছিল সংসারী মানুষদের জন্য।

সংসারী মানুষরাও যাতে ভগবান সেবা করতেপারে তার জন্য তাঁর সরলপ্রাণ চিন্তিত ছিল। সঠিক প্রাণ তো সাধনা পথেই থাকবে কিন্তু সংসারী মানুষরাও যেন পরমেশ্বরকে জানার জন্য এগোতে পারেন তার জন্য গৃহীভক্তদের সর্বদা উপদেশ দিতেন এবং অভয় দিতেন।

শ্রী চণ্ডীতে আছে "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি মায়ে আমাকে রূপ দাও—এটা না। মায়ে আমার চেতনার প্রকৃত স্বরূপ দাও, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের সাথে একাত্ম কর। জয়ং দেহি— আমাকে জয় দাও যে ইন্দ্রিয়গুলোর বিপরীত যুদ্ধ করছি, যাতে আমার মধ্যে কামনা বাসনা এর বিরুদ্ধে আমি জিততে পারি।

হৃদয়ে যে জ্ঞানের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত তা উর্দ্ধমুখে সঞ্চালিত, প্রতিটি প্রাণে এই শিখা বিদ্যমান। এই শিখার আলোয় আলোকিত হয় মন। মন চিনতে পারে তার সঠিক পথ। যে পথে মুক্তি, মায়ার জগত থেকে মুক্ত মন পথ জানতে চায়। পথের হদিস সে পাবেই কারণ সে অজ্ঞানের পথ ছেড়ে জ্ঞানের পথ অনুসন্ধান করছে। হৃদয়াগ্নি শিখা সেই মনকে নিশ্চয় জ্ঞানের পথের সন্ধান দেবে। প্রতিটি প্রাণ, প্রতিটি মন পেতে থাকুক এই বিদ্যা। এ শিখার আলোকে উদ্ভাষিত হয়ে উঠুক প্রতিটি প্রাণ। অবিদ্যা সরিয়ে কেবলমাত্র বিদ্যাই বর্তমান থাকতে প্রতিটি প্রাণে।

—ঃঃ—

ভগবৎ প্রেম

ভক্তিপ্রসাদ

পৃথিবী হলো আমাদের ভালোবাসার জগৎ। এটাই আমাদের বাসস্থান। আমাদের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না, কর্মপ্রবাহের ভিত্তিভূমি হলো এই পৃথিবী। মানুষ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে। এখানে যে শুধু আনন্দই আছে তাই নয়। দুঃখ, অভাব, বঞ্চনা, মান, অভিমান ইত্যাদিও আছে। এখানে বিপদ আছে। আবার বিপদ থেকে ত্রাণ লাভ করার উজ্জ্বল আনন্দ অনুভূতিও এই পৃথিবীতে থেকে অনুভব করা যায়। এখানে অনুভব করা যায় ভালবাসার কোমল স্পর্শ। নিকট আত্মীয় পরিজন থেকে অবলা জীব প্রত্যেকের প্রেম অনুভব করার ক্ষেত্রও হলো এই পৃথিবী। এই পৃথিবীর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সে অনুভব করতে পারে ভগবৎ প্রেম। তার উদ্বেগ নিরসন করে এই প্রেম তার মনকে শান্ত করে তোলে। তার মন প্রেম প্রবাহে অবগাহন করে ধন্য হয়ে ওঠে।

স্ত্রী, পুত্র, পরিজন পরিবৃত মানুষ আকড়ে পড়ে থাকতে চায় এই পৃথিবীতে। যন্ত্রণা কাতর হয়েও তাকে বাঁচিয়ে রাখে মানবপ্রেম। এখানে এসে খুঁজে পায়তার জন্মদাত্রী মাকে। শত অভাব তাকেস্পর্শ করতে পারে না। মাতৃস্নেহ তাকে আগলে রাখে। মা নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ান। পৃথিবীর যে কোনো প্রাণীর মধ্যে সন্তান প্রতিপালনে মা এর ভূমিকা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সন্তানের যে কোনো অভাব, অভিযোগ নিরসন করেন মা। এই মা যেমন আমাদের জন্মদাত্রী হতে পারেন। তেমনি মাতৃরূপ ধারণকারী যে কোনো নারী প্রেম বিতরণে আমাদের ধন্য করতে পারেন। জ্বরে আক্রান্ত পিতার কাশি হচ্ছে। তার কষ্ট নিবারণ করার জন্য তার ছোট্ট মেয়েটি একটা ভিক্স লজেন্স এনে তার মুখে পুরে দিচ্ছে। বিস্মিত পিতা তার কন্যার মধ্যে অনুভব করেন ভগবৎ প্রেম। মা পাখি খাদ্য সংগ্রহের তাগিদে চলে যায় অনেক দূরে। কিন্তু মন তার পরে থাকে বাসায় থাকা সন্তানের প্রতি। ছোট্ট ঠোঁটে সামান্য খাদ্য সংগ্রহ করে সে ঠিক তার নিজের বাসা খুঁজে সন্তানকে খাওয়ায়। সেদিন একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে মা খরগোশ গর্তের ভিতর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে আর তার সাতটি সন্তানকে সে স্তন্য দুগ্ধ পানের সুযোগ করে দিচ্ছে। এটাই ভগবৎ প্রেম।

শ্রীশ্রী ঠাকুর তাই মা নামে আত্মহারা। মা কৃপা করে যা করেন তাতেই তিনি সায় দেন। আমাদের তিনি এই পৃথিবীতে থাকতে বলেছেন বিড়ালছানার মতো। মা কৃপা করে যে পরিবেশে রাখেন সেটাই গ্রহণীয়। মথুরবাবুর সাথে কাশী যাত্রা কালে মাঝপথে হত দরিদ্র মানুষদের দেখে তিনি গাড়ি থেকে নেমে যান। তিনি নির্দেশ দেন ওই গরীব মানুষদের এক মাথা তেল, নতুন বস্ত্র আর অন্ন ভোগ দিতে। এটাই ভগবৎ প্রেম। শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর অখণ্ড মাতৃত্ব আমাদের মুগ্ধ করে। তিনি বলেছেন আমি সতেরও মা, অসতেরও মা। তিনি বলেছেন মানুষের দোষ না দেখতে। সবাইকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। এটাই ভগবৎ প্রেম। ভালোবাসাকে তিনি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্ব চরাচরে। মা ডাক শেখাতেই তাঁর এই পৃথিবীতে আগমন। পোকার মতো কিলবিল করা মানুষদের উদ্ধার করার জন্য তাঁর এই পৃথিবীতে আগমন। তাই তো তিনি মা।

—ঃঃ—

ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা

দেবপ্রিয়া ঘোষাল

মানুষ ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য কত যোগ, তপস্যা কত কি করে। কিন্তু ভগবানকে ভালবাসতে কোনো আড়ম্বর, জাঁকজমকের প্রয়োজন নেই শুধু নিষ্ঠার সাথে ভালবাসা, ভক্তি, ব্যাস এইটুকুতেই তিনি ধরা দেন ভক্তের কাছে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তিনি নিজের হাতে তৈরি করেছেন এই জগৎ-সংসার সব মানুষ, পশু-পাখি, জড় সব কিছুর মধ্যে উনি বিরাজ করছেন। আজ এক সত্যিকারের গল্প বলি তালে ভগবানকে মন থেকে ডাকলে তিনি আসেন সামনে ধরা দেন ভক্তের ভালবাসার টানে। এক ভক্ত তিনি ভগবানকে খুব ভালবাসেন। বিশ্বাস করতেন ছোটোবেলা থেকেই। তারপর একদিন তার বিয়ে হয়ে জীবন সুখেই কাটছিল স্বামী-সন্তানদের নিয়ে। সংসার কাটছিল দিনের পর দিন তারপর কয়েক বছর পর হঠাৎ ধীরে ধীরে তার সংসারে অভাব এলো। মহিলাটির স্বামী যা রোজগার করছিল তাতে সংসার চলছিল না সন্তানদের খাওয়া-দাওয়া, পড়াশোনা সবকিছু অসম্ভব হয়ে উঠেছিল চালানো কিন্তু মহিলাটি রাতদিন সংসারে এত অভাবের মধ্যেও ভগবানের প্রতি ভালবাসা, বিশ্বাস এতটুকু কমেনি। তিনি মনে মনে সারাক্ষণ ভগবানকে ডেকে চলতেন ভগবান আমি তোমাকে ভালবাসি বিশ্বাস করি আমার সব ভার দায়িত্ব তোমার উপর অনেক আগেই সপে দিয়েছি তাই আজ আমার সংসার জীবনে যা কিছু হচ্ছে তাতে তোমার উপর দিয়ে বিশ্বাস টলবে না ‘ যা হচ্ছে তা ভালোর জন্য হচ্ছে যা হবে পরে সেটাও ভালোর জন্য হবে’ শ্রীকৃষ্ণ এই বাণী মহিলাটি সবসময় বলতেন। দিন যায়, মাস যায়—বছর যায় আরও খারাপের দিকে যেতে থাকে মহিলার সংসার। একবেলা ডাল-ভাত খেয়ে আরেক বেলার জন্য ভাবতে হত সোজা কথায় নুন আনতে পান্তা ফুরায় এই সংসারে অবস্থা ছিল তার। ঠাকুর বলতেন বুড়ি ছুয়ে থাক পথে যা কিছু বাধা আসবে সব চলে যাবে। মহিলাটিও সেই বিশ্বাসে চলছিল মহিলা দিন, রাত ভগবানকে মনে মনে ডাকতেন প্রার্থনা করে কাদতেন ঠাকুর শক্তি দিও ধৈর্য্য দিও আমি যেন ভেঙে না পরি। সংসারে যত কষ্টই থাক সন্তানদের পড়ালেখা শেখাবই তারপর অনেক গুলো বছর এই ভাবেই কষ্টে চলতে থাকলো মহিলাটির সংসার। তখনও তার ভক্তি ভালবাসা এতটুকু টলেনি ভগবানের প্রতি। তারপর হঠাৎ একদিন এক আগুন্তক আসে এবং মহিলা ও তার স্বামী বলেন এক মন্দিরে যাওয়ার জন্য আগুন্তকে সাথে নিয়ে চললেন স্বামী-স্ত্রী সেই মন্দিরে। মন্দিরে গিয়ে ভগবানকে দেখে মহিলাটি শান্তি পেল মনে আর সব কথা ভগবানকে বলেন মন্দিরে বসে। ভগবান সব শুনে আর মুচকি হেসে বললেন। বাড়ি যাও সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর সেই মন্দিরে প্রতি রবিবার করে যাওয়া শুরু করলেন স্বামী-স্ত্রী তারপর আসতে আসতে তার সন্তানদেরও নিয়ে আসলেন। ভগবানের প্রতি বিশ্বাস, ভালবাসা থাকলে মরুভূমিতেও জল পাওয়া যায়। মহিলার জীবনেও আসে হঠাৎ এক ভালো খবর মহিলা চাকরি অফার পেল এক কলেজ। মহিলাটি বুঝলেন ভগবান তাকে দুই হাত ভরে আশীর্বাদ করেছেন। আসতে আসতে ভক্তের সংসারে অভাব কাটতে লাগলো। তার সন্তানদের পড়ালেখা শেখাবার ইচ্ছা স্বপ্ন পূরণ হতে লাগলো। ভগবানকে সরল বিশ্বাসে ভক্ত ডেকেছিল ভগবান কি তার ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে, সকল ভক্তদের নিজেদের ওপর আস্থা-আত্মবিশ্বাস থাকা চাই। এই জন্মেই ভগবানলাভ করব তাকে জানার বোঝার চেষ্টা করব এই দেহ-মন নিয়ে এই জীবনেই ভগবানকে পাব। ভগবানকে ডাকতে তাকে চিন্তা করতে কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না এমনি একমনে তার বলা কথাগুলো স্মরণে মননে করলেই হয় এই দ্বিতীয় কোন পথ নেই। যে একবার এই ভাগবত পথের চলার আনন্দ পেয়েছে তার আর অন্য কোন পথের দরকার নেই।

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তিঃ

—ঃঃ—

মা এর স্নেহসুধা

ভক্তিপ্রসাদ

এই ধরিত্রী আমাদের মা। ইনি আমাদের বিভিন্ন ফল, ফুল, ওষধি গাছের শক্ত কাণ্ড, পাতা ইত্যাদি প্রদান করেন। নির্মল, স্নিগ্ধ বাতাস আমাদের শান্ত করে। জল দান করে তিনি আমাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেন। সূর্যের আলো, তাপ পথ চলতে এবং শীতের প্রাবল্য রোধে আমাদের সাহায্য করে। গাছের স্নিগ্ধ ছায়া প্রখর রোদে আমাদের শান্তি দেয়। বৃষ্টির জলধারায় স্নাত হয়ে আমরা আনন্দ পাই। ফলের মিষ্টত্বে আমাদের জিহ্বা আনন্দ পায়। ফুলের বর্ণ ও মিষ্ট গন্ধ আমাদের মনকে প্রাণবন্ত করে তোলে। এক স্বর্গীয় অনুভূতি মনের সব অশান্তি ধুয়ে মুছে দেয়। আবার ওষধি আমাদের রোগ নিরাময় করে দেয়। যখন যা প্রয়োজন ধরিত্রী মা সব আমাদের সরবরাহ করেন। আমরা কি ভাবে ভালো থাকবো এইসব দায়িত্বই তাঁর। আবার প্রয়োজনে শাসন করতেও এই ধরিত্রী মা পিছপা হন না। ঝড়, বজ্র গর্জন, ভূমিকম্প, বন্যা আমাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ধরিত্রী মা আমাদের সংযত হওয়ার

নির্দেশ দেন ঠিক যেমন আমাদের মা করেন। এইভাবে স্নেহে ও শাসনে আমরা মানুষ হয়ে উঠি প্রকৃতির কোলে।

তাই মানুষ হয়ে ওঠার তীব্র আকুতি মানুষের মনে জেগে ওঠে। মা এর কাছে তার আবেদন মা আমাকে মানুষ করো এই মিনতি ও রাঙা পায়। মানুষ হয়ে ওঠার ইচ্ছা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে। আসলে মানুষ হলে খুব আনন্দ হয়। মানব মন প্রস্ফুটিত গোলাপেরমত সৌরভ ছড়াতে থাকে। মনে কোনো অশান্তি থাকে না। গঙ্গা স্নান করে সদ্য ওঠা মানবদেহের মতো পবিত্র হয়ে ওঠে। বিবেক জেগে ওঠে। মনে কোনো পাপ বা লোভ থাকে না। সে তখন দেখতে পায় সেই আনন্দধাম যেখানে ভগবানের অধিষ্ঠান। তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে সে ধন্য হয়ে ওঠে। সে তার জাগ্রত দশার প্রতিটা মুহূর্তে অনুভব করে চন্দনের গন্ধ। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। সাধারণ মানুষ রূপান্তরিত হয় ভক্তে। এতো মা এরই দান। মা এরই কৃপা। মা দয়া করে পথ ছেড়ে না দিলে মানুষ ভক্তে উন্নীত হতে পারে না। মা এর স্নেহ সুধা আমাদের মনকে কোমল করে। আমরা সৎ চিন্তায় সমৃদ্ধ হই।

কিন্তু কখনো কখনো আমরা জীবনের ঘাত প্রতিঘাত এ চঞ্চল হয়ে উঠি। কি করা উচিৎ তা আমরা স্থির করতে পারি না। রোগ ব্যাধি, মানসিক আঘাত, কিছু হারানোর বেদনা আমাদের অস্থির করে তোলে। জীবন তো সবসময় সোজা, সরল পথে চলে না। কখনোই চলে না। সব সময় সব কিছু ঠিক ঠিক পরিমাপ মতো পেয়ে অনুকূল পরিবেশে কাল যাপন করা কাল্পনিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। দুঃখ কষ্ট তো আমাদের জীবনে আসবেই। তাই সর্বদা মা এর স্মরণ মনন করা ছাড়া আমারে গতি নেই। হয়ত গোটা পা বাদ যেত। মা এর কৃপায় সেটা না হয়ে হয়তো একটা কাঁটা ফুটল পায়ে। কর্মফল তো ভোগ করতেই হবে। আমরা নিজেদের অজান্তে কতো শত ভুল করি। অন্যায় করি। এর একমাত্র প্রতিকার মা এর স্মরণ। যার পেটে যা সয় সেটা সরবরাহ করা মা এরই কাজ। এই মা সব্বার। স্নেহে, শাসনে সন্তানকে ভুল শুধরে দেন মা। আমাদের খুব ইচ্ছা করে একটু অন্যায় করার। কিন্তু মা সব সময় আমাদের নিষেধ করেন। ঠিক যেমন হাতি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে কোনো লোকের বাগানের কলা গাছটা খাওয়ার জন্য শুঁড় বাড়ায়। তখন মাহুত তাকে আঘাত করে। তাকে বোঝায় তার ওই কাজটা অন্যায়। তার ওই কাজ করার কোনো অধিকার নেই। আসলে হাতি অবলা জীব। তার কোনো পর, আপন বোধ নেই। কিন্তু মানুষ নিজেরটা বেশ ভালোই বোঝে। তাহলে সে তো অবশ্যই ভালো হবার চেষ্টা করবে। চেষ্টা করবে মা এর কৃপা লাভের। আর মা কৃপা করেন অযাচিত ভাবে। তিনি অকাতরে প্রেম বিতরণ করেন। অগণিত ভক্তকে উদ্ধার করার দায় তো মা এর। মানুষকে অন্ধকার থেকে আলো তে নিয়ে আসার দায় তো মা এর। তাই তো তিনি মা।

—ঃঃ—

তোমার কথা

মনোজ বাগ

তোমার পূজার কোন ফুলই শুকায় না।
তোমার আলোয় কোন কিছুই ছুপায় না।
তোমার সীমানা, অসীমানায়।
তোমার অবস্থান, সব ঠিকানায়।
তবুও তোমার কোন ভাব-ই ফুরায় না।
তোমার ভিতর কোন সুরই জুড়োয় না।
কারো সুরই কারো কথাই তোমার মধ্যে হারায় না।
সবই জানো, সবই তোমার চেনা।
নিয়ম অনিয়ম তোমায় বাধে না।
যে কোন অসম্ভবই, তোমাতে সম্ভব।
তুমি নিজেই নিজের পরম বৈভব।
তোমার চলায় কোন পথই শেষ হয় না।

—ঃঃ—

চেয়ে আছি

মনোজ বাগ

তুমি আমাতে নেই।
তুমি আছো অন্য কিছুতে।
অন্য কারোতে।
আমি তোমাতেই আছি।
আমি তোমারই হয়ে আছি।
আমি তোমারই মুখ চেয়ে বসে আছি।
আমার যা কিছু সবই তোমার জন্য রেখেই
আমি তোমাতেই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছি।
মাঝে মাঝে ভাবি-ঠিক কতটা তোমার মুখ চেয়ে আছি আমি।
ঠিক কতটা তোমার হয়ে আছি আমি।
শুধুই তোমার জন্য কতটা, আমি।
আঁকড়ে থাকা সব খড় কুটোগুলি পাশে সরিয়ে রেখে দেখছি—
তুমি আছ তোমার সবটুকু জুড়ে
কখনো ভালো কখনো মন্দ যখন যেমন।
আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছি।

—ঃঃ—

জানতে হবে

মনোজ বাগ

জানতে হবে—সবই জানতে হবে।
জানতে হবে ফুল পাখি লতা পাতাকেও।
জানতে হবে আকাশ বাতাস মাটি কুটো-কাটাকেও।
যে জানে, তার সবই আছে— বোধ বুদ্ধি ভক্তি বিশ্বাস।
তার নেই অসন্তোষ-অবিশ্বাস।
যে জানে না, তার সব থেকেও কিচ্ছুটি নেই।
যে জানে না, তার কিছু না থেকেও আছে অনেক কিছুই।
আছে মোহ মাৎসর্য।
সে ভাবছে এই তো সব-এগুলিই তো ঐশ্বর্য!
যে জানে, সে সবই জানে।
জানে বলেই মানে।
সে যে দেখছে সবই।
শুনছে সবই।
বুঝছে সবই।
যে জানে না, সে আসলে অন্ধ, বধির...
সে অন্য কারোর মতাপেক্ষী, মুখাপেক্ষী।
যে অন্যের মুখাপেক্ষী, সে স্রোতের কুটো,
ডুবে থেকেও সে ভেসে যাচ্ছে-কিন্তু কোথায়!
জানতে হবে, সব জানতে হবে।
যে জানে, সে জানে।
জানে, সে কে, সে কী, কোথায় তার অবস্থান।

—ঃঃ—

তোমার আকাশ

মনোজ বাগ

তোমার আকাশ সবার আকাশ।
তোমার আকাশ কত্তো বড়!
আমার আকাশ আমার একার।
আমার আকাশ একটুখানি।
তোমার আকাশে অনেক সূর্য,
অনেক চাঁদ, অনেক তারা।
আমার আকাশে সূর্য একটাই,
চাঁদ একটাই আর তারারা-তারারা সব
একটু একটু একটি একটি বিন্দু বিন্দু।
অন্ধকারে ফুটে উঠলেও,
আলো ফুটলেই মিলিয়ে যায়।
তোমার আকাশ আলোর আকাশ
তোমার আকাশ আলোয় আলো।
তোমার আকাশে অন্ধকারও,
আলোরই আর এক রূপ, অন্য আলো।
আমার আকাশে আলো অন্ধকার—
অন্ধকার আলো, একে অন্যতে মেশামেশি।
আমার আকাশে কে আগে, কে পরে—
কে নিচে, উপরে— এ সবেরই রেষারেষি।
তোমার আকাশ চরৈবেতির।
তোমার আকাশএগিয়ে চলার।
সবার জন্য, সবার বলেই
তোমার আকাশ অনেক খানি।

—ঃঃ—

মা চেনা শিশু

মনোজ বাগ

মা চেনো – ও, মন, আগে মা জানো।
আগে বোঝো মা কী!
হও মা চেনা, মা জানা, এক অবোধ শিশু।
যে মা চিনেছে, মা জেনেছে
সে আর কোন কিছুতেই মজবে না।
বাক্যবাগিশ মন বাক্য বোঝে।
কথায় কথায় মন ভোলানোর ফিকির খোঁজে।
কত কত আসুন বসুন
দেখনদারি কায়দা কানুন
সব প্যাঁচপয়জার ছেড়ে ছুঁড়ে
আগে মা চেনো, ও, মন—আগে মা জানো।
ধর্ম সত্যে তত্ত্ব কথা যত।
আচার বিচার সংস্কারও তত।
এর এক বিন্দুও লাগে না মা চিনেত, মা জানতে।
যে মা চিনেছে, মা জেনেছে, জানে।
ও মন, এই কথাটা তো মানো।
আগে মা চেনো, মা জানো।

—ঃঃ—

শ্রী অনির্বাণের সঙ্গে সংলাপ

আশুরঞ্জন দেবনাথ (শিলিগুড়ি)

বোধন এবং শারদীয়া পূজা সম্পর্কে স্বামী সত্যানন্দকে শিলং থেকে লেখা শ্রীঅনির্বাণের দু'টা চিঠি ঃ

(১)

শিলং, ২৯-৯-৬৩

সত্য,

তোমার চিঠি পেলাম

দুর্গাকে বৈদিক দেবতা না ব'লে পৌরাণিক দেবতা বলাই ভাল। পুরাণ বেদ হ'তে বিযুক্ত নয় তয়বে এর মধ্যে যেমন বৈদিক ভাবনার সমাবেশ আছে, তেমনি বেদোত্তর ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। প্রাণবন্ত একটা সংস্কৃতি ক্রমে এগিয়ে চলে, সমৃদ্ধ হয়—স্থানু হয়ে একজায়গায় বসে থাকে না।

দুর্গা নামটি যেমন করেই হোক বাংলাদেশেই বেশী চলে। আসলে ইনি পুরাণে শুধু 'দেবী' বলে উল্লিখিতা। ইংরেজীতে যেমন God, বেদে তেমনি 'দেবঃ'। তাঁর শক্তিই 'দেবী'। এই দেবী বেদে 'অদিতি'। তন্ত্র তাঁকে বলবেন, মহাশক্তি বা মহামায়া। আমাদের দুগর্হার ভাবনা আর অদিতির ভাবনা একইরকম।

শক্তির একটি নিমেষরূপ আর একটি উন্মেষরূপ আছে। সপ্তশতীর তিনটি চরিত্রের মধ্যে প্রথম চরিত্রটি নিমেষরূপ, আর তৃতীয়টি উভয়রূপ। প্রথম চরিত্রটিকে বলা হয়েছে 'বিষ্ণুমায়া'। বিষ্ণু আদিত্য। কোনও কোনও সম্প্রদায়ে বিষ্ণুই 'দেবঃ'। তাহলে 'দেবী' বিষ্ণুমায়া। এই বিষ্ণু একসময় ভগ নামে জনাসধারণের দেবতা ছিলেন। ভগ থেকে ভগবান্, তা থেকে ভাগবত-সম্পরদায়। বিষ্ণু বা ভগ আদিত্য। আদিত্যের প্রত্যক্ষরূপ সূর্য। আদিত্যই ইন্দ্ররূপে বৃত্রঘাতী। বৃত্র অসুর — সোজা কথায় অদিব্যা। পর্বে-পর্বে অবিদ্যার নাশই দেবকৃত্য। দেবশক্তির দ্বারা বা দেবীর দ্বারা তা নিষ্পন্ন হচ্ছে। দুর্গার মধ্যে আমরা সেই অসুর-ঘাতিনী মহাশক্তিরই পূজা করছি। এই ভাবটি অর্বাচীন নয়—অতি প্রাচীন। এই ভাবকে ভিত্তি করে কালক্রমে অন্যান্য ভাবের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ভাবের কিছুটা সমৃদ্ধতর বিবর্তনও হয়েছে। কিন্তু দুর্গাপূজ বা শক্তিপূজা বেমালুম বেদবাহ্য বা অনার্য, এ কথা আমি স্বীকার করি না। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়, দুর্গার পূজা বা আরাধনার মধ্যে কোন্ বিষয়টি আগন্তুক, তা কেউ স্পষ্ট ক'রে দেখিয়ে দেবেন কি?

তার অনুরূপ আচার অনার্য-সমাজে কোথায় আছে দেখিয়ে দেবেন কি? একেবারে কিছু যে নাই, তা বল্‌ছি না। কিন্তু তা নিতান্তই আনুষঙ্গিক, মূল বিদ্যার প্রাণ নয়, অলঙ্করণ মাত্র। যাক্, এসব কথা এখন তুলতে চাই না। যে কথা বলছিলাম।—

ভগ নামে যে-আদিত্য তাঁর দু'টি পত্নীর কথা বেদে আছে—শ্রী এবং লক্ষ্মী। 'শ্রী' প্রাচীনকালে বোঝাত সরস্বতী বা প্রজ্ঞাকে। এই প্রজ্ঞা এবং লক্ষ্মী মূল দেবীর বিভূতিরূপে তাঁর পাশে স্থান পেয়েছেন। কুমার অগ্নির একটি বিশেষণ। তিনিই হয়েছেন কার্তিক (কৃত্তিকা-নক্ষত্র অগ্নি-নক্ষত্র, দেকতে অগ্নিপুঞ্জের মত। এক সময়ে সংবৎসরের আদি বলে গণ্য হত বলে দেবাদি অগ্নি তার অধিষ্ঠাতা)। অগ্নির শক্তি বাক্, অতএব বাচস্পতি অগ্নির আরেক নাম। বাগ বৃহতী বা ব্রহ্মশক্তি অতএব বাচস্পতি বৃহস্পতি। এই বৃহস্পতিই ঋক্ সংহিতায় গণপতি ব'লে উল্লিখিত হয়েছেন। তিনিই পুরাণের গণেশ।

দেবী যদি অদিতি হয়ে থাকেন, আদিত্যমণ্ডল যদি তাঁর প্রত্যক্ষদৃষ্ট প্রতিরূপ হয়ে থাকে, বৃত্র বা অন্ধকার-নাশ যদি তাঁর প্রধান কৃত্য হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর দশভুজা হওয়ার তাৎপর্য বোঝা যায়। আদিত্যের কিরণকে কর বলা হয়। একটি বিম্ব হ'তে করগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। লক্ষণীয়, হিন্দুর দেবতার বহু কর, কিন্তু বহু চরণ নয়। দেবতা যদি পুঞ্জজ্যোতি হন, তাহলে তাঁর কিরণরাজিই হবে কর। দশভুজা দুর্গা তাহলে প্রত্যক্ষদৃষ্ট আদিত্যবিম্বের শিল্পসম্মত রূপ।

অগ্নি দেবতাদের আদি আর বিষ্ণু বা আদিত্য তাঁদের শেষ—একথা বেদে আছে। অগ্নিশক্তির দুঐটি রূপ — একটি কর্ম, আরেকটি প্রজ্ঞা। কর্ম রক্ষোনাশন বা অসুরবধ (ঋগ্‌বেদে অগ্নিকে বৃত্রঘাতী পুরন্দরও বলা হয়েছে)। অগ্নির কম আর প্রজ্ঞা-রূপই যথাক্রমে কার্তিক আর গণপতি। আর আদিত্যের প্রজ্ঞা আর আনন্দশক্তি যথাক্রমে সরস্বতী আর লক্ষ্মী। মাঝখানে দেবী—অদিতি না মহাশক্তি।

দুর্গার এই ভাবকল্পনাই মূল। তারপর তার সঙ্গে অনেক কিছুর যোগাযোগ ঘটেছে; সে-কথা সত্য। কিন্তু মূল ভাবটি কোথাও তো বিকৃত হয়নি।

যাই।

বড়দা

(২)

হৈমবতী, শিলং
২২-০৯-৬৩

সত্য,

'বোধন'-সম্পর্কে আজ দু'চার কথা বল্‌ছি।

প্রথমেই প্রশ্ন হবে, দেবীর আবার বেধন কি? তিনি কি ঘুমিয়ে আছেন? তিনি সব জীবের চেতনা, তাঁর আবার ঘুম আর জাগরণ কি।

ব্যাপারটাকে বিচার করতে হবে আমাদের অর্থাৎ সাধকদের দিক থেকে। রূপ গোস্বামী বলেছিলেন, 'নিত্যসিদ্ধস্য ভারস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা' — যে-ভাব নিত্য-সিদ্ধ, তাকে হৃদয়ে প্রকট করে তোলাই হল তার সাধ্যতা। অতএব তিনি জেগেই আছেন, কিন্তু আমি তো তা বুঝতে পারছি না, এ বোঝবার চেষ্টাই বোধন। আসলে দেবীর বোধন নয়, আমারই হৃদয়ের বোধন।

বোধনের প্রসঙ্গ এসেছে আবার ারেক দিক থেকে। উত্তরায়ণে দেবতারা জেগে থাকেন, ও হ'ল তাঁদের দিবাকাল। আর দক্ষিণায়নে তাঁরা ঘুমিয়ে থাকেন, ও হ'ল তাঁদের রাত্রিকাল। এ-ও দিবারাত্র, আমারই চেতনায়। বেদে আদিত্যোপাসনার কথাই প্রধান। প্রত্যক্ষ যে-আদিত্যকে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাঁকে জান্‌ছি সেই পরম জ্যোতি ব'লে। আমার চেতনার সঙ্গে তাঁকে এক ক'রে নিচ্ছি। এই জ্যোতির একটা বৃদ্ধি এবং হ্রাস দেখতে পাই উত্তরায়ণে এবং দক্ষিণায়নে। বস্তুত পরমজ্যোতি অয়নের অতীত। কিন্তু প্রাকৃত-ভূমিতে তাঁর জ্যোতির বৃদ্ধি-হ্রাস দেখা যায়, এ-ও তো সত্য। যখন জ্যোতি ক্রমবর্দ্ধমান তখন সাধনায় প্রকৃত আমার সহায়। যখন জ্যোতি ক্রমক্ষীয়মান, তখন প্রকৃতি আর দক্ষিণা নন, বামা। ওই ক্ষয়ের মধ্যেই পৌরুষের দ্বারা, আত্মশক্তির দ্বার, আলোকে জিইয়ে রাখতে হবে অন্তরে। বোধনের সাধনায় এই পৌরুষের ব্যঞ্জনা আছে।

ষষ্ঠীতে বোধন কেন? পঞ্চদশ তিথিকে পাঁচটি ধরে তিন ভাগ করা হয়েছে— পঞ্চকের নাম ঃ নন্দা ভদ্রা জয়া রিক্তা পূর্ণা। চেতনার তিন ভূমিতে তিনটি পঞ্চক। প্রথম ভূমিতে আমাদের আত্মচৈতন্য জাগ্রত থাকে না, কিন্তু তিনি জেগে থাকেন এবং তিথিনিত্যার কাজ ঠিকমতই চলতে থাকে। এ হ'ল আমাদের অগোচরে তাঁর ক্রিয়া—যেমন শৈশবে। দ্বিতীয় ভূমিতে আমাদের আত্মচৈতন্য জাগ্রত হয়। সাধনা তখনই শুরু হতে পারে—আত্মসচেতন হয়ে। তাই তখনই বোধন করা বা বোধন হওয়া প্রাসঙ্গিক।

ষষ্ঠী তিথিটি নন্দা তিথি। দেবী নন্দা, কি-না আনন্দময়ী। তখন তিনি বালিকা। ভদ্রাতে তিনি সুমঙ্গলা, তাঁর কৈশোর। জয়াতে তাঁর শক্তিরূপের প্রকাশ, তিনি তখন তরুণী। রিক্তা'তে তিনি যোগিনী, পূর্ণাতে সমর্থা যুবতী। তিথিনিত্যার ভাবনা এইভাবে করতে হয়। ষষ্ঠী হতে দশমী পর্যন্ত তাঁর আরাধনা এই ভাব ধরে।

বিল্বমূলে বোধন কেন? শাস্ত্রে কতগুলি দিব্য-বৃক্ষের কথা আছে। পুরুষের বেলায় তাদের বেলা হয় ব্রহ্মবৃক্ষ, আর প্রকৃতি বা শক্তির বেলায় কুলবৃক্ষ। বিল্ব দুই-ই — তবে বিশেষ ক'রে কুলবৃক্ষ। তার রহস্য এই ঃ

দেবীর যে যন্ত্রমূর্তি, তা ঊর্ধ্বত্রিকোণ আর অধস্ত্রিকোণ দু'য়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়। মুখমণ্ডলকে একটি ঊর্ধ্ববিন্দু আর দু'টি স্তনকে দু'টি সমতল অধোবিন্দু আর দু'টি স্তনকে দু'টি সমতল অধোবিন্দু কল্পনা ক'রে যে ত্রি-কোণ হয় তা ঊর্ধ্ব কোণ। এটি তাঁর অগ্নিরূপ। আর যোনি অধস্ত্রিকোণ। এটি তাঁর সোমরূপ। বিল্ববৃক্ষের পাতা ত্রিপত্র—দুর্বার মত, ত্রিশূলের মত। এটি হ'ল যোনির প্রতীক। আর বিল্বফল স্তনের মত। মুখ বৃক্ষচূড়ায় কল্পনা করতে হয়। তাইতে বিল্ববৃক্ষে ঊর্ধ্ব এবং অধঃ দু'টি ত্রিকোণেরই সমাহার দেখা যায়। আবার এই বৃক্ষ কণ্টকাবৃত বলে অস্পর্শ। অর্থাৎ দেবী অগম্যা কুমারী। এটি তাঁর ব্রহ্মভাব। অতএব এই বৃক্ষে অগ্নি ও সোমের, ব্রহ্ম ও শক্তির সমন্বয় ঘটেছে বলে স্বদেহকে এই বৃক্ষরূপে ভাবনা কগরে তার মূলে কিনা মূলাধারে দেবীর বোধন করতে হবে। এই হল বোধনের রহস্য।

পরবর্তী ৩১-০৮-৬৭ তারিখের চিঠিতে আরও লিখেছেন,

আমি ৩রা সেপ্টেম্বর কেদার-বদ্রী রওনা হচ্ছি। ফিরতে ফিরতে পূজা এসে যাবে। এই শেষ চিঠি। এরপর বিজয়ার চিঠি পাবে, যদি ফিরে আসি।

এখানকার যে শূন্যতা, তাকে ভয় কোরো না, কিংবা তার প্রতি যেন বিরাগ না আসে। একেও সহজভাবে গ্রহণ কর। তাহলে ভাল-মন্দ রূপ-অরূপ দুয়ের ঊর্ধ্বে মহাশূন্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তখন দেখবে মানসীর ভূমিকা ছিল চিন্ময়ীর পাদপীঠ রচনা করা। তোমার প্রশান্ত অকামহত মহিমায় মধ্যে কত মানসী আলোর ফুলঝুরি হয়ে ফুটছে আর ঝরছে। তখন একটি শুধু নয়— আশেপাশে হাজার মানসীর মধ্যে সেই চিন্ময়ীকে দেখতে পাভে—কোতাও হাসির ঝিলিকে, কোথাও চোখের বিদ্যুতে, কোথাও তনুলতার দোলনে, কোথাও রূপে, কোথাও গুণে।

দেখতে দেখতে যাকে তোমার প্রাণ চেয়ে এসেছে এতকাল, তাকে তিলোত্তমারূপে হৃদয়ে পাবে।

এই অসাড় অবস্থাটা যেন মাটির নীচে বীজের অবস্থা—অঙ্কুরোদ্‌গমের আগে।

স্নেহাশিস অনির্বাণ

নির্ধারিত সময়ে বিকাল চারটায় পৌঁছলাম। এবারে সাথে আমার বন্ধু করুণাও ছিল। স্বামীজি সেই পূরপরিচিত ঘরে বে আছেন একই আরাম কেদারায়। ঘরে আরও দু'চারজন দর্শনার্থী রয়েছেন। শান্ত-স্তব্ধ পরিবেশ; যেমন বরাবর থাকে। প্রণাম করে একপাশে বসলাম। জিজ্ঞাসা করলেন, 'চিঠি পেয়েছ?' (যে চিঠির উদ্ধৃতি প্রথমেই দিয়েছি?) বললাম পেয়েছি। স্বামীজি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বিশেষ কোন কথা আছে? থাকলে চল পাশের ঘরে যাই। বললাম কাল আছেন তো? বরং কাল সকালে আসব। তা আসতে পার; সকাল দশটায় আসতে পারবে? বললাম পারব। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রণাম করে সবাই চলে গেলেন। স্বামীজিকে একান্ত করে পেলাম। আরও কাছে এসে বসলাম।

প্রসঙ্গ নর-নারীর প্রেম। "হৃদয় আকাশে থাকে না ভাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি?" মানবিক প্রেমকে যদি এই 'দেহহীন জ্যোতিতে' পরিণত করতে পার তবেই তোমার প্রেম সার্থক। দেহ শুধু হাতে আসে, কড়ি ও কোমল কাব্যের এ আর্তি পরবর্তী রবীন্দ্র কাব্যে দেহহীন প্রেমের কী সুন্দর পরিণতি লাভ করেছে তার বিস্তৃত বর্ণনায় স্বামীজি রবীন্দ্র কাব্যের অনেক উদ্ধৃতি দিলেন। 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়ারে দেবতা।'

প্রসঙ্গত নদীর গতির সাথে প্রেমের তুলনা দিয়ে স্বামীজি বললেন, 'প্রেমের প্রাথমিক গতি নদীর মতই দুর্বার; তারপর ক্রমে সে গতি শিথিল হয়ে আসে, ব্যাপ্তি লাভ করে। পরিণতি লাভ করে সমুদ্রের অসীমতায়।

বললেন, 'মেয়েরা চায় মহিমাময় সাথী, পিতার মত। কাপুরুষতাকে ঘৃণা করে। স্নেহে, প্রেমে, ভালবাসায় পরিপূর্ণ এক মহিমাময় পৌরুষের পূজারী প্রত্যেক মেয়ে। পুরুষের কামকে এঁরা ভয় পায়, ঘৃণা করে। মেয়েদের সুপ্ত কামনাকে পুরুষই জাগিয়ে তোলে। নইলে তারা চায় প্রেম, কাম নয়। কিন্তু পুরুষ একবার যখন জাগিয়ে তোলে তখন আর সামাল দিতে পারে না। স্বামীজি তন্ত্রাভিলাষী সাধুসঙ্ঘের এক ভৈরবী মায়ের উক্তির উদ্ধৃতি দিলেন, "কামকে তোরাই তো জাগাস; তারপর আর সামাল দিতে পারিস না।" তারপর স্বামীজি প্রসঙ্গতঃ ওনার এক বন্ধুপত্নীর কথা বললেন. বন্ধুপত্নী স্বামীজিকে বড় দুঃখে বলেছিলেন, "আমার বড় দুঃখ হয় ও (ভদ্রমহিলার স্বামী) যখন আমার দেহের দুয়ারে ভিক্ষা মাগে। আমি যখন ওর বুকে হাত রাখি, ভিতরটা আমার আলোয় ভরে ওঠে। কিন্তু ও সেটা বোঝে না, ভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।" বলে স্বামীজি বললেন, 'কি বেদনাময় পরিণতি! এই বেদনা প্রায় প্রতিটি নারীর। অথচ পুরুষ তা বোঝে না; বুঝতে চায় না। স্বামীজি আরও বললেন, "মেয়েটি ৩/৪ সন্তানের জননী। খুব পিতৃভক্ত। যতদূরেই থাকুক বৎসরে একবার অন্ততঃ বাবার কাছে আসবেই। কয়েকদিন থেকে বাবার সেবা যত্ন করবে। পৌরুষের যে মহিমা স্বামীর মধ্যে পায়নি; তাই পেয়েছে পিতার মধ্যে। স্নেহধন্য কন্যা বাবার মধ্যে পেয়েছে তার জীবন দেবতাকে।

ব্রসঙ্গতঃ স্বামীজি ডিকেন্সের (Charles Dickens) এক উপন্যাসের গল্প বললেন। যেখানে নায়ক নায়িকাকে ভালবাসত প্রাণ দিয়ে; অথচ ওদের বিয়ে হয়নি। মেয়েটির বিয়ে হল অন্য এক পুরুষের সাথে। কিন্তু নায়ক মেয়েটিকে মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারেনি। মেয়েটি স্বামীর গিলোটিনের হুকুম হয়। নায়ক তা নিজে স্বাকীর করে ওর স্বামীকে বাঁচিয়ে দেয়। নায়ক কি এখানে কিছুই পায়নি? না পেলে এত সহজে কী করে প্রাণ বিসর্জন দিল! নরনারীর একটা সুন্দর সম্পর্কের কতা বলতে গিয়ে স্বামীজি শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর দ্বথা বললেন। নামেও তাঁদের সামঞ্জস্য আছে, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণা। পরস্পর শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও সৌহাদ্যের এক অপরূপ সম্পর্ক। *** *** মেয়েরা চায় প্রেম, দেহ নয়, কামনা নয়। যুগে যুগে মেয়েরা পুরুষকে প্রেম বিলিয়েছে; ভাল বেসেছে সমস্ত অন্তর দিয়ে। তাই তো শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে বলেছিলেন, "রাই, তুমি আমার প্রেমের গুরু?" প্রেম কি এত সহজ?***

এতসব বলে, যার অনেকটাই মনে রাখতে পারিনি, স্বামীজি বললেন, "যাও এইটুকুই আজ গিয়ে ভাব; তারপর কাল আরও বলব?" ক্রমে আরও অনুরাগী ভক্তজন আসতে শুরু করলেন। স্বামীজি তাঁর খাদ্য প্রত্যাগত কেদার-বদরী ভ্রমণের সুন্দর বর্ণনা দিলেন। মন দিয়ে শুনলাম। অতঃপর প্রণাম করে আজকের মত বিদায় নিলাম।

পরদিন রবিবার; ১৫ অক্টোবর। স্বামীজির কথামত সকাল দশটায় কেয়াতলা রোডের বাসায় হাজির হলাম। স্বামীজি তখন শ্রীমতী নারায়ণী দেবী ও অন্যান্য দু'একজন অনুরাগী ভক্তজনদের সাথে গল্প করছেন। যেতেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'দশটা হয়ে গেছে?' বললাম,হ্যাঁ। প্রণাম করে পাশে বসলাম। "ওকে সময় দিয়েছি; ওর কিছু ব্যক্তিগত কথা আছে। ও শিলিগুড়ি থেকে এসেছে" — বলেই স্বামীজি বললেন, চল পাশের ঘরে যাই?" তখন নারায়ণীদেবী বললেন, 'তুমি যাবে কেন, আমরাই যাই', — বলে ওনারা সব বেরিয়ে গেলেন। কেউ গেলেন অন্দর মহলে, কেউ বসে রইলেন বারান্দায়।

স্বামীজি সান্নিধ্যে নারায়ণী দেবীর সাথে আরও কয়েকবার দেখা হয়েছে। কিন্তু কোনদিনই আলাপ পরিচয়ের আগ্রহ দেখাইনি। অথচ ওনার লেখার সাথে পরিমিত ছিলাম। শুধু নারায়ণী দেবী বলে কথা নয়। বিভিন্ন সময়ে স্বামীজির সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে অনেক জ্ঞানী-গুণী বিদ্বজ্জনদের দেখা পেয়েছি। কিন্তু আমার মুখচোরা স্বভাবের (introvert) জন্য আলাপ পরিচয়ের এমন সুবর্ণ সুযোগ সদ্ ব্যবহার করিনি।

(ক্রমশঃ)

—ঃঃ—

বিশ্বাসে-নির্ভরতায়-ভালবাসায়-নিবেদনে হোক ব্রহ্মলাভ

অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন ধারণের রয়েছে যত উপকরণ, মানুষেরই সৃষ্টি সে সবই। মানুষই পারে সব অধিকারকে বরণ করে, গ্রহণ করে নিয়েও ক্রমে নিজেকে ভগবানের পথে উৎসর্গ করতে। মানুষই পারে সকল রকমের বাধাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে ভগবানের পথে। এরই জন্য প্রয়োজন দৃঢ়, অঙ্গীকৃত বিশ্বাস। ভগবান স্বয়ংই চেতন্য হয়ে হয়েছেন বিস্তৃত জীবনের বিকাশের সব পর্বেই ভগবত্তার বার্তা আর ভগবত্তার আবেশকে ব্যাপ্ত করতে।

বিশ্বাসই ভগবৎ পথের প্রধান স্তম্ভ। বিশ্বাসকে করতে হয় জীবনের প্রধান পাথেয়। বিশ্বাসের তাৎপর্য হল ভগবানের সার্বিক অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস। বিশ্বাসকে হতে হবে জীবনের চেতনায় ব্যাপ্ত। জীবনময় যা কিছু রয়েছে জাগতিক উপাদান সে সবের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে বিশ্বাসের নানা অবলম্বনের সূত্র বিশ্বাসের প্রতি হানিকর যা কিছু রয়েছে জগতের মাঝে সে সবেরই আদি উৎস ভগবত্তার শক্তি। ভগবৎ কৃপাতেই এই জগৎ জীবনের সব কিছুই। তিনি এসবই করেছেন দান। আবার সেই তিনিই নিহিত রয়েছেন এই সমগ্র সৃষ্টির অঙ্গে অঙ্গে। তিনি আমোঘ রূপেই সব জীবনকে ধারণ করে রয়েছেন। মহাপ্রাণ রূপে এই অনন্ত বায়ুর প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন প্রাণ সংযোগ করে স্বতঃই। ভগবান স্বয়ংই এই সৃষ্টির সর্বত্র বিরাজিত। অনন্ত তাঁর এই প্রকাশ। মহাকাশে তিনি বিস্তৃত হয়ে রয়েছেন সৃষ্টির সর্বত্র তাঁর মহিমাকে দিয়েছেন ছড়িয়ে। সদাই তিনি ভাস্বর। তিনি নিত্যই মহাপ্রকাশে ব্যাপ্ত। সর্বক্ষণই তাঁরই বিশেষত্বের ক্ষণ। অনুতে, কণাতে তিনি হয়ে রয়েছেন বিশেষ। যে জীবন তাঁকে সরল বিশ্বাস, আর ভালবাসায় বরণ করে নেয়, ক্রমান্বয়ে সমগ্র সত্যকে সে পেয়ে যায়।

Supervised Machine Learning – Where the programmer trains machine to identify patterns and extract rules from those patterns. In the unsupervised Machine Learning the algorithm automatically sorts out through the help pictures and reviews and classifies certain thing as good or bad on its own. Unsupervised learning is how Alibaba and Amazon sigure out that two items are often bought together.

A third and even more advanced phase of machine learning is called reinforcement learning, when the machine learning algorithm is constantly corrected based on feedback.

Developing a digiotal mindset also means accepting that, in many cases machines are better than humans in making certain predictions and doing specific tasks. Researching at second National University Hospital and college of Medicine developed an AI algorithm called DLAD (Deep Learning based automatic Detection) to analyze chest radiographs and detect abnormal cell growth with potential cancers. In a four year study the hospital found that the AI was able to dramatically reduce the number of overlooked lung cancers on chest radiographs without a proportional increase in the number of follow-up chest CT examinations.

(Paul Leonardi &Tsedal Neelay, The Digital mindset, Harvard Business Press, 2022, p. 36.)

সৃষ্টির সবই সত্যময়, মিথ্যার হাতছানি রয়েছে এখানে অবশ্যই। মিথ্যাটিও সত্যের স্বরূপ জানবার ও বুকে নেবার পথে একটি ধাপ। মিথ্যার প্রভাব জগৎময় ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। অবশ্য এই জগৎময় ব্যাপ্ত প্রতিটি মিথ্যার কণা ও উপাদান সত্যেরই অনুসঙ্গী। সত্যময় এই জগতের সব অস্তিত্বই সত্য। ভগবানকে চাইছে যে সত্যকেই জগতে প্রতিষ্ঠা করছে। যে ভগবানকে জানতে চায় না, মানতে চায় না — সে এই পরম সত্যময় জগতের মাঝে ভগবৎ স্পর্শ আর ভাগবতী প্রজ্ঞাকে নিজ জীবনের বাহ্য ও পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেই সত্য বিষয়ে নির্বিকার, বিরুদ্ধতায় সোচ্চার, অথবা সমগ্র সত্যের এই জগৎ মহিমার আকর্ষণে লুপ্ত হয়ে যায়।

যিনি ভগবানকে চাইবার, বুঝবার, জানবার জন্য প্রকৃতভাবে হবেন আগ্রহী, তারই হবে সময় সত্য ও মিথ্যার মধ্যেকার সম্পর্কসূত্র বুঝে নেবার। মিথ্যাটি প্রকৃতপক্ষে সত্যেরই উপর লেপে দেওয়া এক আবরণ যাকে ভেদ করেই পৌঁছতে হয় সত্যের অন্তঃপুরে। এই বিশ্বের সব উপাদানকে সমাদরে গ্রহণ করে তবেই বুঝে নেওয়া হবে সম্ভব কেমন সেই সত্যের স্বরূপ।

ভগবৎ সত্য হল পূর্ণ সত্য। ভগবানকে জানতে পারে যে তারই হয় ঐ পূর্ণ সত্যের উপর অধিকার। আর অন্য সবের এই পূর্ণ সত্যের যে যে অংশের প্রেরণা ও বিকাশ হয় তারই জন্য জ্ঞান ফুটে ওঠে। তাই এটি বিশেষভাবে ফুটে ওঠা সত্যের কণা পরিচয় মাত্র।

বিশ্বাসে ভালবাসায় যিনি ভগবানকে জানবার জন্য ব্যাকুল, ক্রমে কৃপাশক্তি তাঁরই সমর্থনে ও সহযোগে এসে যায়। কৃপাশক্তিই ভক্তজন ও সাধককে সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেয় ভগবানের স্বরূপ। তিনি অনন্ত, অসীম, ভূমায়, আকাশে, অন্তরিক্ষে, বায়ুতে, জলে, স্থলে, পাতালে সর্বত্র বিরাজিত যে পরম পুরুষ, সেই তিনিই অন্তরে অসীম প্রেমময় কৃপাশক্তির ডালি নিয়ে উপস্থিত জগৎ মাঝে, মানবের সমীপে। যে তাঁকে তেমন করে চায় সে পেয়ে যায়। ভগবানকে ভালবাসায় বিশ্বাসে নির্ভরতায়, একান্ত আপনত্বে বরণ করতে যিনি চাইবেন, বিশ্বময়, জীবনময়, তিনিই প্রাপ্ত হবেন ব্রহ্মজ্ঞান।

—ঃঃ—

সত্যের পথ

প্রাপ্তিস্থান ঃ কোলকাতা ও অন্যত্র।

(1) বেলঘরিয়া 1 No. Platform, কোলকাতা – 56

(2) বেলঘরিয়া 2 No. / 3 No. Platform
কোলকাতা – 56

(3) বারাকপুর রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে।

(4) **বিশ্বনাথ চক্রবর্তী,** নৈহাটি রেল স্টেশন
4 No./5 No. Platform

(5) **গীতা সাহিত্য মন্দির**
হালিশহর রেল স্টেশন 2 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(6) **বাপ্পা বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন টিকিট কাউন্টারের সামনে
(কল্যাণী লোকাল যে Platformএ দাঁড়ায়) নদীয়া

(7) **শ্যামল বুক স্টল**
কল্যাণী রেল স্টেশন 1 No. Platform, নদীয়া

(8) **সাধনা বুক স্টল**
বারাসাত রেল স্টেশন 3 No. / 4 No. Platform
উঃ ২৪ পরগণা

(9) ব্যাণ্ডেল রেল স্টেশন Platform, হুগলী

(10) **জৈন বুক স্টল**
শ্রীরামপুর রেল স্টেশন 4 No. Platform, হুগলী

(11) শিয়ালদহ রেল স্টেশন (নর্থ), কোলকাতা

(12) **রতন দে বুক স্টল**
যাদবপুর মোড়, কোলকাতা

(13) **সন্তোষ বুক স্টল**
নাগের বাজার, কোলকাতা

(14) **শ্যামা স্টল**
টালীগঞ্জ মেট্রোর সামনে, কোলকাতা

(15) **তপা চক্রবর্তী,** চিড়িয়ামোড়, কোলকাতা

(16) গোলপার্ক মোড়, কোলকাতা – 29

(17) **বিরাটী রেলওয়ে বুক স্টল**, কোলকাতা

(18) **সর্বোদয় বুক স্টল**
হাওড়া স্টেশন

(19) লেকটাউন থানার নীচে
কোলকাতা – 89

(20) বাগবাজার উদ্বোধন কার্যালয়ের উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(21) বাগবাজার মায়ের বাড়ীর উল্টোদিকে
কোলকাতা – 3

(22) **বাবু বুক স্টল**
সিঁথির মোড়, কোলকাতা

(23) **দমদম ক্যান্টনমেন্ট বুক স্টল**
কোলকাতা

(24) **কালী বুক স্টল**
শোভাবাজার মেট্রো, কোলকাতা

(25) **সুব্রত পাল**
সল্টলেক পি.এন.বি., ব্লক-বি.এ., কোলকাতা।

(26) **সল্টলেক** 4 No. **ট্যাঙ্ক,** কোলকাতা

(27) **নস্কর বুক স্টল,** AB/AC মার্কেট (সল্টলেক)

(28) **নরেশ সাউ,** বৈশাখী মোড়, কোলকাতা।

(29) **দেবাশিষ মণ্ডল,** জি.ডি. মার্কেট, সল্টলেক

(30) **আশিষ বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(31) **চ্যাটার্জী বুক স্টল,** বাগুইআটি মোড়, কোলকাতা

(32) **টি দত্ত,** কুমার আশুতোষ (মেন) স্কুলের পাশে

(33) **মন্মথ প্রিন্টিং**
জপুর রোড, দমদম, কোলকাতা-৭০০ ০৭৪

(34) **পণ্ডিত এস. কে. ব্যানার্জী,** বিশিষ্ট পুরোহিত
দেশবন্ধুপাড়া, বৌবাজার, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ০০৪
মোবাইল ঃ ৮৯৭২৮০৭৮৫৪, ৯০৬৪৬৩৬১০২

SATYER PATH
1st May 2024
Baishakh–1431
Vol. 22. No. 1

REGISTERED KOL RMS/366/2022-2024
Regn. No. WBBEN/2006/18733

Price : Rs. 5/-

দিব্য সাধন ঃ পার্থিব জীবনেই ঈশ্বরলাভ

বেদ, উপনিষদ, ভাগবত, ব্রহ্মসূত্র ও ভাগবত গীতা অবলম্বনে
আলোচনায় ঃ অধ্যাপক (ডঃ) রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্-লাইনে দিব্য জীবন ও সাধনার ক্লাস চলছে ঃ—

রবিবার : ৫ই মে, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১২ই মে, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ১৯শে মে, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

রবিবার : ২৬শে মে, ২০২৪ — দিব্য যোগ ও ন্যাস যোগ

প্রতি রবিবার বিকাল ৫-৩০ থেকে ৭-০০ পর্যন্ত।

যে কোন ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগ দিতে পারেন **Android Phone**-এর অথবা কম্প্যুটারের সাহায্যে।
অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য **Invitation** দরকার।
যদি ইচ্ছা হয় তবে যোগাযোগ করুন ঃ—
শ্রী এস. হাজরা ঃ ৯১৬৩৩৯৩৬৩৩
আপনার **email id,** নাম ও **Phone Number SMS** করে পাঠান।
Website দেখুন ঃ **www.satyerpath.org**

স্থান : ডঃ আর. পি. ব্যানার্জী
ডি. এল-১১/৫, সল্ট লেক সিটি (চতুর্থ তল)
কলকাতা—৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৫৯ ৪১৮৩
(সল্ট লেক করুণামমীর নিকট সি. কে. মার্কেটের বিপরীতে)

Printed and Published by Bibudhendra Chatterjee, Printed at Classic Press, 21, Patuatola Lane, Kolkata–9 and Published at Satyer Path, 21, Patuatola Lane, Kolkata–700 009.
Editor : Dr. Ramaprosad Banerjee, DL-11/5, Salt lake City, Kolkata–700 091.